ইসলামে নারীর অধিকার এবং তার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা

A thesis submitted towards partial fulfilment of
the requirements for the degree of

M Phil in Women's Studies
Course affiliated to Faculty of Interdisciplinary Studies,
Law and Management
Jadavpur University

Submitted by

SABIYA KHATUN
Examination Roll No: **MPWO194016**

Under the guidance of

PROFESSOR KUNAL CHATTOPADHYAY
Department of Comparative Literature,
Jadavpur University

School of Women's Studies
Jadavpur University
Kolkata 700032
2019

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের প্রায় সব কিছুতেই না শুনতে হয়, আর তা যদি হয় মুসলিম রক্ষণশীল সমাজ তাহলে ধরেই নেওয়া হয় মেয়েরা অবদমিত। মুসলিম সমাজের অংশ হবার কারনে আমিও এরকম অনেক না এর সম্মুখীন হয়েছি। যেমন-রজঃস্বলা হলে নামাজ পড়তে পারবে না, রোজা করতে পারবে না কারন তখন নারী অশুচি। ছোটোবেলায় অত কিছু না ভাবলেও ভাবার বয়সে ভাবতাম ইসলাম কি নারীদের শুধুই অবদমিত করে রেখেছে নাকি অধিকারও দিয়েছে। সেখান থেকেই ভেবে রেখে ছিলাম উচ্চ শিক্ষায় পৌঁছোলে নারীর ধর্মগত অধিকার নিয়ে গবেষণা করবো। অবশেষে ২০১৭ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা বিভাগে ভর্তি হলাম আর ভাবনাটাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ পেলাম। তার জন্য মানবী বিদ্যাচর্চা বিভাগকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মানবী বিদ্যাচর্চা বিভাগের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণকে এবং গ্রন্থাগারিক দিদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।

এছাড়াও আমার বিভাগীয় বন্ধুদের ও আমার অন্যান্য বন্ধুদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব কারণ তারা সবাই আমাকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করেছে। আর ঋণী থাকব আমার পরিবারের কাছে যাদের সহায়তা না পেলে আমি এতদূর আসতে পারতাম না।

ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার পথপ্রদর্শক কুণাল চট্টোপাধ্যায়কে যার ঐকান্তিক সহায়তা না পেলে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করতে পারতাম না। আমার অনেক ভুলভ্রান্তি শুধরে দিয়ে তিনি গবেষণাটিকে সরল করে দিয়েছেন। তাই তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

ভূমিকা ১-৫

১) প্রথম অধ্যায় : ইসলাম ও নারীর অধিকার ৬-২৫

২) দ্বিতীয় অধ্যায় : ভারতে নারীর অধিকার ও আইন ২৬-৪৪

৩) তৃতীয় অধ্যায় : গবেষণা ফলাফল ও বাস্তবচিত্র ৪৫-৬২

উপসংহার ৬৩-৬৪

গ্রন্থপঞ্জি ৬৫-৭৩

মুখবন্ধ

আমার গবেষিত বিষয়টির নাম হল ইসলামে নারীর অধিকার ও তার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।মুসলিম নারীদের ব্যক্তিগত জীবন ও তার অধিকার নিয়ে এই গবেষণা কার্যটি চালানো হয়েছে। তার জন্য একটি বিশেষ বয়স ক্রমের, বিশেষ আয়কৃত পরিবারের বিবাহিত নারীদের উপর ফোকাস করা হয়েছে। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান সম্বন্ধে জানার প্রয়াস করা হয়েছে।

এর জন্য দুটি ভিন্ন পরিবেশের নারীদের উপর মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা চালানো হয়েছে। গবেষণাটির জন্য বারুইপুর পৌরসভার অন্তর্গত পঞ্চাশ জন নারী এবং মন্দির বাজার এলাকার পঞ্চায়েত অন্তর্গত পঞ্চাশ জন নারীর উপর গবেষণা চালানো হয়েছে। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় অধিকার, শিক্ষার হার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন দিক গুলির উপর আলোকপাত করার প্রয়াস করা হয়েছে।

ভারতে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে দুই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ মুসলিম বাস করে। পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ মিলিয়ন মুসলিম বাস করে। এই মুসলিম সমাজেরই একটা অংশ হল মুসলিম নারী। যারা আজও পিছিয়ে আছে বিশেষ করে নিম্ন-আয়ের পরিবারে মেয়েরা শিক্ষা বঞ্চিত ও সামাজিক অবস্থানে পিছিয়ে আছে। আমার গবেষণায় দেখা গেছে যে , নারীরা তাদের মৌলিক অধিকার গুলি থেকে বঞ্চিত। তাদের কর্মনিযুক্তিও অনেক কম। উক্ত গবেষণাকৃত এলাকায় কোনো নারীকেই সরকারি চাকুরীতে নিযুক্ত পাইনি। বেশিরভাগ নারীই স্বাবলম্বী নয় আর্থিক ভাবে। আর্থিকভাবে স্বনির্ভর না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আসা খুব মুশকিল।

ধর্মগত অধিকার সম্বন্ধে তারা ওয়াকিবহল নয়। ফলত সেইদিক থেকেও তারা বঞ্চিত। দুটি ভিন্ন পরিবেশের নারীদের উপরে করা এই গবেষণার তথ্য জানাচ্ছে যে, যদিও তুলনামূলক বিচারে শহরাঞ্চলের নারীরা গ্রামের নারীদের তুলনায় একটু হলেও এগিয়ে আছে। তাও সার্বিক বিচারে উক্ত দুটি জায়গার নারীদের অবস্থান খুব একটা আশাপ্রদ জায়গায় নেই।

ভূমিকা

১.১। গবেষণার বিষয় ও সারসংক্ষেপ : আমার গবেষণার বিষয় হল ইসলামে নারীর অধিকার ও তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ভারতের ক্ষেত্রে ইসলাম হল দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম এবং মুসলিমরা হল বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ইসলাম নিজস্ব আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় যা শরিয়া আইন নামে পরিচিত। এই আইনটি কোরানের সুন্নাহের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলতে পারি যে ইসলাম ছাড়া অন্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটা ধারনা আছে যে ইসলাম হল একটি নারী দমনকারী ধর্ম। এটা সত্যি যে কিছু সমস্যা আছে কিন্তু প্রচার মাধ্যম ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কথার ফলে লিঙ্গবৈষম্যকে একতরফা ইসলামের সমস্যা হিসেবে দেখানোর প্রবণতা আছে। যেমন এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে আমরা তিন তালাকের কথা বলতে পারি। এ নিয়ে তর্কের কোনো জায়গা নেই যে তিন তালাকে স্ত্রী পরিত্যক্তা হলে তাঁকে খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু প্রথমত, যে কোনো ক্ষেত্রেই যে কোনো ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলে(সেটা তিন তালাক দিয়ে হোক আর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে হোক) স্ত্রী প্রায়ই অসহায় অবস্থায় পড়েন। সেটা না দেখা মানে লিঙ্গ সাম্যের জন্য নয়, মুসলিম বিরোধী প্রচারের জন্য কথাটা উঠেছে।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই, তা হলে দেখব, ইসলাম এক স্থানে, এক নির্দিষ্ট পরিস্থিতে উদ্ভূত এবং সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের বেশ কিছু অধিকার দিয়েছে। ইসলাম অনুযায়ী নারীদের ব্যক্তিগত অধিকারগুলি হল-

১। শিক্ষা ও কর্মনিযুক্তির অধিকার

২। জীবনসাথী পছন্দ করার অধিকার

৩। মেহের পাওয়ার অধিকার

৪। বিবাহের পর যৌথ নাকি একক পরিবারে থাকবে সে বিষয়ে অধিকার

৫। বৈধ কারণ দেখিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার অধিকার(তালাক-এ-তাফইয)

৬। বিবাহের পর পদবি পরিবর্তন না করার অধিকার

কিন্তু ধর্ম নিছক আপন গতিতে চলে না। এক এক দেশে, ইতিহাস, রাজনীতি, তাকে প্রভাবিত করে। ভারতে মুসলিম নারীর অবস্থান যথেষ্ট অনগ্রসর। সাচার কমিটির প্রতিবেদন দেখিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য -সবই কম। আর মুসলিম মেয়েদের সামাজিক অবস্থা অনেক সময়েই একটা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পরিণত হয়, যেখানে স্বঘোষিত সম্প্রদায়ের প্রধানদের সঙ্গে লড়াই বাধে না এক নাগরিকত্বের কথা তোলা কার্যত হিন্দু সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ প্রচারকর্তাদের।

২০১১ সেনসাস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ৪৬ লাখ মিলিয়ন মুসলিম বাস করে। এই মুসলিম সমাজের অংশ মুসলিম নারী আজও সামাজিক অবস্থানে পিছিয়ে নিজেদের এই অধিকারগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে। কোরান কিন্তু মুসলিম নারীর এই নিম্ন অবস্থানকে সমর্থন করে না।

১.২। গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা : বর্তমান গবেষণাটি করার পিছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে; সেগুলি হল,

ক। বিবাহিত মহিলারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত কি না তা খুঁজে দেখা।

খ। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা কত শতাংশ বিবাহিত মহিলা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় এসেছে তা খুঁজে বের করা।

গ। পরিবারে তাদের অবস্থান ও ক্ষমতায়ন কতটা হয়েছে তা খুঁজে দেখা।

বর্তমান ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক সময়ে সমাজে মুসলিম মেয়েদের অবস্থান নিয়ে জোর আলোচনা চলছে এবং এই আলোচনার শেষে একটাই কথা উঠে আসছে ইসলাম নারীদের দমন করে রেখেছে সেই অতীতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। ইসলাম নারীদের অধিকার বিহীন দাসী বানিয়ে রেখেছে। যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ তাৎক্ষণিক তিন তালাক যা নিয়ে গণমাধ্যম থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে এটা দেখাতে যে এই প্রথা কিভাবে নারীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। অথচ কোরানে তিন তালাক বলে কোনো বিষয়ই নেই। উল্টে নারীর ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত করার জন্য প্রচুর অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এটাও সত্যি যে মুসলিম নারীরা নিজেই নিজেদের ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ, যা সমাজে তাদের নিম্ন অবস্থানের জন্য দায়ী। এরূপ দোলাচলে আমার এই গবেষণা মুসলিম মহিলাদের সহায়তা করতে পারে নিজের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত হতে। এছাড়াও পূর্বে মুসলিম মহিলাদের নিয়ে গবেষণা করা হলেও তার বিষয়বস্তু ছিল ভিন্ন। যেমন-শিক্ষা, কর্মনিযুক্তি, বহিঃজগতে পদার্পণ, স্বাস্থ্য, গতিময়তা ইত্যাদি। তাই আমি আমার গবেষণার মাধ্যমে বিবাহিত মুসলিম নারীদের জীবনের এই বিশেষ দিকটির উপর আলোকপাত করতে চাই, যার মাধ্যমে পরবর্তীকালে মুসলিম মহিলাদের ধর্মগত অধিকার নিয়ে একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করা যাবে।

১.৩। গবেষণা পদ্ধতি : সামাজিক গবেষণা পদ্ধতিকে মূলত দুভাগে ভাগকরা যায় -গুণগত ও পরিমানগত পদ্ধতি। আমার বর্তমান গবেষণাটি পরিমানগত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গবেষণাটির জন্য মুখ্যত প্রাথমিক তথ্যের সাহায্য নেব। এই গবেষণাকার্যটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি ক্ষেত্রসমীক্ষার সাহায্য নিয়েছি। এর জন্য বদ্ধপ্রান্ত প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এছাড়াও বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট এর সহায়তা নিয়েছি। বর্তমান গবেষণাটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে দুই ধরনের চলক (variables) নেওয়া হয়েছে তা হল-

ক। স্বাধীন চলক (independent)

- শিক্ষা

খ। নির্ভরশীল চলক(dependent)

- ক্ষমতায়ন

১.৪। প্রশ্নমালা :

১। আপনি এখন কী করেন? -গৃহিণী/ চাকুরি

২। আপনি কতদূর পড়াশোনা করেছেন? -মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ স্নাতক/ উচ্চশিক্ষা

৩। আপনি কোরান পড়তে জানেন? -হ্যাঁ/না

৪। আপনি কি ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার সম্পর্কে অবহিত? -হ্যাঁ/না

৫। বিয়েতে কি আপনার মতামত নেওয়া হয়েছিল? -হ্যাঁ/না

৬। দেনমোহর কি আপনি নির্ধারণ করেছিলেন? -হ্যাঁ/না

৭। আপনি যে ধরনের পরিবারে আছেন সেটা কি আপনার সিদ্ধান্তে? -হ্যাঁ/না

৮। আপনার কি সন্তান আছে? -হ্যাঁ/না

৯। সন্তান সংখ্যা নির্ধারণ ও জন্ম ব্যবধান বিষয়ে আপনার মতামত কি গ্রাহ্য হয়? -হ্যাঁ/না

১০। আপনার উপার্জিত অর্থ কি আপনি নিজ ইচ্ছাতে খরচ করতে পারেন? -হ্যাঁ/না

১১। পারিবারিক খরচাদির সিদ্ধান্তে আপনি কি সামিল হন? -হ্যাঁ/না

১২। গৃহস্থালির কাজকর্ম কি যৌথভাবে করেন? -হ্যাঁ/না

১৩। সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ে কি আপনার সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হয়? -হ্যাঁ/না

১.৫। অধ্যায় বিন্যাস : সমস্ত গবেষণাপত্রটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা যেখানে গবেষণার বিষয় ও সারসংক্ষেপসহ গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, গবেষণাপদ্ধতি এবং অধ্যায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলাম ও নারীর অধিকার নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে ইসলাম পরিচিতি ও নামকরণ, ধর্মগত এবং ঐতিহাসিকভাবে ইসলামের উৎপত্তি, ভারতে ও বাংলায় ইসলামের আগমন, ভারতীয় ইসলামিক পরিচয় গঠন, ইসলামে নারী, ইসলামের ভিতরে সংস্কার ইত্যাদি নানান পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতে নারীর অধিকার আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ছয় ধরনের মৌলিক অধিকার, সংবিধানে নারীর সুরক্ষা, ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে নারী নির্যাতন ও বিভিন্ন আইন ও পারিবারিক আইন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষণালব্ধ ফলাফল ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং শেষে উপসংহার যোগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম ও নারীর অধিকার

ইসলাম পরিচিতি ও নামকরণ : ইসলাম শব্দটির অর্থ হল ‘অনুগত হওয়া ও আনুগত্য করা, আদেশ নিষেধ মেনে চলা ও শান্তির পথ অনুসরণ করা’[১]। ইসলামি পরিভাষায় জীবনে চলার পথে যাবতীয় প্রয়োজনে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা ও তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী জীবন ধারন করাকেই ইসলাম বলে। আদি পিতা হযরত আদম থেকে শুরু করে ইশা (আ.), মুসা(আ.) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মহম্মদ পর্যন্ত সকল রাসূলের জীবন ইতিহাস হতে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করি।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে প্রত্যেক নবী রাসুল এর দীন একমাত্র ইসলাম হলে ও তাদের শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আর শরীয়তের এরূপ পার্থক্যের ফলেই হযরত মুসার প্রবর্তিত ধর্ম ইহুদী ধর্ম, হযরত ইসার ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম হিসাবে পরিচিত হয়েছে। তাদের ধর্ম বিশ্বাস, আল্লাহ, ফেরেস্তা, পরকাল, ইত্যাদির প্রতি ধারনা ও বিশ্বাস ছিল ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু আহকাম ও শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কোরানে ইরসাদ করা হয়েছে, ‘আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত ও সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি’।

ইসলামের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় হযরত ইব্রাহিম সর্বপ্রথম এ ধর্মের নাম ইসলাম মনোনীত করেন ও তাঁর অনুসারীদের ‘উম্মতে ‘মুসলিমা’ নামকরণ করেন। কোরআনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, ‘হে আমাদের প্রভু আমাদের উভয়কে মুসলিম তথা আপনার আনুগত্যকারী হিসাবে কবুল করুন এবং আমাদের বংশধর থেকে ও উম্মতে মুসলিমা বা অনুগত জাতি সৃষ্টি করুন’।

অন্য একটি সুরাতে বলা হয়েছে, ‘এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্ম। তিনি পূর্বেই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম’।

সর্বশেষ নবী হযরত মহম্মদকে প্রেরণ করে আল্লাহ দীন ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেন। কোরআনে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম'[২]।

ধর্মগত ভাবে ইসলামের উৎপত্তি : কোরানে বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম উৎপত্তির বর্ণনা করা আছে। যেমন 'আকাশ (স্বর্গ) এবং পৃথিবী হচ্ছে সেই লক্ষণ যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য এবং নিজের সৃষ্টিতে এবং যে প্রাণীটি পৃথিবীর ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে তা নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন এবং প্রত্যেক পরিবর্তিত দিন এবং রাতে আল্লাহ তাদের জন্য আকাশ থেকে জীবিকা প্রদান করেন এবং মৃত্যুর পর তাদের পুনরুজ্জীবিত করেন এবং বায়ু পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে' (৪৫:৩-৫)। কোরানে বলেছে যে, 'আকাশ ও পৃথিবী আলিঙ্গন করার আগেই এক একক হিসেবে তারা একত্রিত হয়ে যাবে(২১:৩০)। এই বিশাল বিস্ফোরণের পর আল্লাহ আকাশের দিকে ফিরে গেলেন এবং ধোঁয়ায় ভরে গেল চারদিক। তিনি পৃথিবীকে বললেন ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত একসাথে এস; তারা বলল আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই একত্রিত হবো (৪১:১১)। এভাবেই গ্রহগুলি তৈরি হল এবং তারারা শীতল হল, তারা একত্রিত হল ও আকৃতি প্রাপ্ত হল'। আল্লাহ তৈরি করেছেন, 'সূর্য, চাঁদ, গ্রহগুলি তাদের নিজস্ব কক্ষপথ অনুযায়ী'(২১:৩৩)। কোরআনে এসেছে, 'আল্লাহ প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করেছে পানি থেকে'[৩]।

বিশ্বে মানবজীবন শুরু হয় আদম(পুরুষ) এবং ইভ(নারী)-এই দুই নরনারীর মাধ্যমে। কোরান বর্ণনা করেছে, 'আল্লাহ আদমকে কীভাবে কাদামাটি থেকে আকৃতি দান করে সৃষ্টি করেছে(১৫:২৬) এবং তাঁর বংশধরদের তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন'[৪]।

ঐতিহাসিক ভাবে ইসলামের উৎপত্তি : সপ্তম শতকে(AD) মহম্মদ নামক এক আরব বণিকের হাত ধরে মক্কা শহরে ইসলাম এর উৎপত্তি ঘটে। মহম্মদের জন্মের এই শতকে খ্রিস্টান ধর্ম ইউরোপে রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে বিদ্যমান ছিল। ইসলামের বাণী উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়াসহ বহু অঞ্চলে বাণিজ্যিক পথ ধরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই বাণিজ্যিক পথের অন্যতম কেন্দ্র ছিল মক্কা যার মাধ্যমেই পণ্য ও বিশ্বাস এর আদানপ্রদান ঘটেছিল

মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতীয় মহাসাগরের উপকূলে। তবে এটা অস্বীকার করা যায় না যে ইসলাম প্রভাবিত ছিল ইহুদী ও খ্রিস্টান বিশ্বাস দ্বারা, যেমন মহম্মদ বলেছিলেন যে অদৃশ্য দূত জিবরাঈল তাঁকে ঈশ্বরের বার্তা পাঠাচ্ছেন এই ঘটনাটি খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মেও বর্ণনা করা আছে। ইবরাহীম, ঈশা, মূশা এঁরা সবাই ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দূত। ৬১৩(AD)তে মহম্মদ নিজেকে ঈশা, মূশা এঁদের মতো দূত ঘোষণা করেন। এই সময় প্যাগান আরবরা সহনশীলতা এবং উৎসাহিত হলেন এই নতুন দূত সম্পর্কে। তারা আন্তরিকভাবে খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও একটা নতুন বিশ্বাসের জন্য জায়গা করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মক্কাবাসী কোরায়েশদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব হয়। এই কোরায়েশদের কোথাও একেশ্বরবাদী, কোথাও বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলা আছে। এই দ্বন্দ্বের সময়ে তিনি ও তাঁর অনুগামীরা ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা ত্যাগ করে মদিনা চলে যান। ৬২৪তে মুহম্মদ ও তাঁর বাহিনী মুসলিম দুনিয়ার প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধে মক্কাবাসীদের হারিয়ে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর মৃত্যুর পর খলীফা তন্ত্রের সূচনা হয় এবং ইসলামের চার খলীফা বংশ যথাক্রমে রুশদিন, উমায়েদ, আব্বাশীয়, অটোমান খলীফারা পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলে[৫]।

ভারতে ও বাংলায় ইসলামের আগমন : সম্ভবত ১০০০ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে আরব মুসলমান বণিকদের আগমনে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীতে তুর্কীদের আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে রাজ্যগুলোতে তুর্কী প্রশাসন গড়ে ওঠে ও তাঁদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনের ওপর শাসন পরিচালনা শুরু করে। মুঘল আমল পর্যন্ত কোরানের বিধি মোতাবেক শাসন পরিচালনা চলতে থাকে[৬]। যদিও স্থানীয় প্রথা ও রীতিনীতি ও মানুষ মেনে চলত। তবে ভারতে মুসলিমরা সংখ্যায় অল্প বলে ইলতুৎমিস, বলবন, থেকে পরে আকবর বিভিন্ন সুলতান ও বাদশাহ ভারত শাসনকে পুরোপুরি কোরান ভিত্তিক শাসন করতে চান নি।

একথা সর্বসম্মত যে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বক্তিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের (১২০৪) মাধ্যমে বাংলায় রাজকীয় ভাবে ইসলামের আগমন ঘটে। ইখতিয়ার তৎকালীন

বাংলার সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেন। তাঁর বাংলা বিজয়ের পর দলে দলে মুসলিমগন বাংলায় বসতি স্থাপন করে ও ধর্ম প্রচার শুরু করে। এভাবেই বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটেছিল বলে অনেকে মনে করেন। তুর্কী শাসন থেকে শুরু করে মুঘল শাসন ও পরবর্তীতে নবাব আমল পর্যন্ত এভাবেই ইসলাম প্রসারিত হতে থেকেছে। তবে ইটন যে ব্যাখ্যা করেছেন তা দেখায়, দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে ইসলামের প্রবেশ ছিল সুফীদের হাতে এবং স্থানীয় প্রথার সঙ্গে মেলবন্ধন করে ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

বাংলায় আরব বণিকদের আসার অনেক আগেই কিছু সুফী সাধকরা(একাদশ শতক) ইসলাম নিয়ে এসে গিয়েছিলেন। ইসলাম অধ্যুষিত মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন সময় শত শত সুফী-দরবেশ বাংলাদেশে আগমন করেন ও ইসলাম প্রচার করেন। রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলাম আসার আগেই কিছু সুফীসাধকরা এখানে পৌঁছে গিয়েছিল[৭]।

খলজি বাংলায় যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল তা ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বাংলাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং লক্ষণাবতীকে মুসলিম রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলে, যা পরবর্তীতে মুঘল অধীনে চলে যায় এবং তাঁদের পরে নবাবরা পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীনভাবে তা শাসন করে। এরই সাথে সাথে ইসলাম ধর্মের প্রসারণ ঘটে[৮]।

ভারতসহ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমগ্র মুসলিম সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথাক্রমে -সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়। সুন্নিদের মধ্যে চারটি আইনী ধারা আছে, যথাক্রমে - হানাফি, শাফেয়ী, মালেকি, হানাবালি। হানাফি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আজম আবু হানিফা। তিনি তাঁর সমসাময়িক নানা বিষয়ে পারদর্শী চল্লিশজন জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে এই মতবাদটির প্রচলন করেন। এই দলটি কুফা নামেও পরিচিত। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে এই মতবাদের অনুসারীদের আধিক্য বেশি[৯]। শিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম জাফর। শিয়াদের মধ্যে তিনটি দল বর্তমান আছে। সেগুলি হল যথাক্রমে - ইসমাইলিয়া, ইছনা আছারিয়া, জায়দিয়া। বর্তমান ইরানে (পারস্য) এই মতবাদের তৎপরতা

লক্ষকরা যায়। এছাড়া ভারতের বোহোরা এবং খোজা (আগাখানি) হল ইসমাইলিয়া দলের অন্তর্গত। লক্ষণৌ ও হায়দ্রাবাদে শিয়ারা বেশি উপস্থিত। এছাড়া অন্যত্র এরা সাধারণত সংখ্যালঘু[১০]।

শরিয়াত সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয় আফগান ও তুর্কী শাসনকালে এবং পরবর্তীতে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের মুসলিম শাসকদের বড় অংশ, আমরা দেখেছ, ছিল হানাফি মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা আইনগত ও রাজনৈতিক কাজের জন্য উলেমাদের উপর নির্ভর করত। তারা ইসলামের সাধারণ আইন ও শরিয়াত মেনে চলত যেমনটা উলেমারা তাদের বলতো। মুঘল বাদশাহরা হানাফি মতবাদী হওয়ার জন্য তারা এমন কাজী নিযুক্ত করত যারা হানাফি আইন দ্বারা পরিচালিত হতো। এইভাবেই ভারতে শরিয়াত প্রবর্তন হয়।

শরিয়াত হল ইসলামের কেন্দ্রীয় কোর এবং নৈতিকতার একটি অবিশ্বাস্য পথপ্রদর্শক কিন্তু আধুনিক ধারনা থেকে এটা কোন আইন নয়। এই আইন শাস্ত্রের আইনকে বলা হয় ‘ফিকাহ’[১১]। এটা একটি জ্ঞান ও চুক্তি যা ইসলামিক আইনের চারটি সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। যেগুলি হল – ‘কোরআন, সুন্নাহ, ঈজমা ও কিয়াস’[১২]।

ভারতীয় ইসলামিক পরিচয় গঠন : আধুনিক যুগের বহু শতাব্দী আগে জাতীয়তাবাদী ধারনাগুলি নিজেদের মতই বিদ্যমান ছিল, তাই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিও সেইভাবেই চলত। ভারতের ক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাপর্বে বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল যারা তাদের আইন, প্রথা, রীতিনীতির মিশ্রতার কারণে শুদ্ধ হিন্দু বা মুসলিম কোন পরিচয়েই পরিচিত ছিল না। যেমন-খোজা, কাচ্ছি মেমন ও অন্যান্য ধর্মান্তরিত গুজরাতি মুসলিম ব্যবসায়ীরা যারা হিন্দু পারিবারিক প্রথা অনুসরণ করত সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করার ক্ষেত্রে[১৩]। ইসলামিক আইনের ব্যবহার বিধিগুলি হিন্দু আইনের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। গ্রামের লোকজন হিন্দু হোক বা মুসলিম নিজস্ব রীতিনীতি ও সংস্কার মেনে চলত[১৪]। এক্ষেত্রে আমরা বাংলার সুন্দরবনের বন বিবি-র কথা বলতে পারি, যাকে হিন্দু মুসলিম উভয়ই পূজা করত, প্রকৃতপক্ষে এখনও করে।

ভারতীয় মুসলিম পরিচয়টি তৈরি হয়েছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আগমনের মাধ্যমে যা গণনা ও শ্রেণিবিন্যাসের প্রবণতা দ্বারা ব্যাপক ভাবে তরান্বিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের সময়ে ব্রিটিশরা ব্যক্তিগত আইনকে বিধিবদ্ধ করতে চাইল, কিন্তু এর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ভারতকে আধুনিকীকরণ করা ছিল না। তাদের এই নমনীয়তার কারণ ছিল ঔপনিবেশিক ভিত শক্ত করা, স্থানীয় অভিজাতদের সাথে পরামর্শ করে একটা কৃত্রিম সমসত্ত্বার(homogenizing) এজেন্ডা তৈরি করা। যার ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত আইন তৈরির ক্ষেত্রে বহুত্ববাদের নীতি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রথা, উদারনীতি কোনটাকেই স্থান দেওয়া হয়নি। ১৭৭২ এর শুরুতে ঔপনিবেশিক শক্তি একটি মোনলিথিক (monolithic) ও পরস্পর বিরোধী হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিগত আইনকে বিধিবদ্ধ করতে ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য মৌলবী এবং পণ্ডিতদের নিযুক্ত করল অর্থাৎ শরিয়াত ও শাস্ত্রের অনুমোদন সাপেক্ষে হস্তক্ষেপ করতে চাইল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা ‘বিচ্ছেদ ঘটাও ও শাসন কর’ নীতি গ্রহণ করল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ঘটাল যাতে তারা বিদ্রোহ না ঘটায়। ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দুদের আলাদা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে তুলতে আগ্রহী করা হল। ধর্মীয় পরিচয় তৈরি করা হয়েছিলো রাজনৈতিক কারণে।রক্ষণশীলরা চেয়েছিলেন বড় আকারের মুসলিম জনসংখ্যার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আনতে। এই নতুন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি ছিল অপর তৈরি করা, যার মানে মুসলিম সম্প্রদায়কে বোঝায়[১৫]। ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগ শরিয়াতকে বিধিবদ্ধ করতে চাইলো ব্রিটিশ আইনের অংশ হিসাবে যাতে ভারতীয় মুসলিমদের ক্ষেত্রে আদালতে কোন আইন প্রয়োগ হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তির অবসান ঘটে। যেহেতু লীগ ভারতীয় মুসলমানের উত্থানে উপকৃত হবে, তাই লীগ শরিয়াতকে একটি ব্যক্তির মুসলিম নেপথ্যে তাঁর প্রাথমিক পরিচয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে দিল। এই রাজনীতি শেষপর্যন্ত শরিয়াত আইন উৎপন্ন করলো যা আজ ভারতীয় মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ১৯৩০ সালে জিন্নাহর লীগ আইনে সংস্কার ঘটাল এবং ত্রিশ শতাংশ আসন মুসলিমদের জন্য প্রভিন্সিয়াল কমিটিতে সংরক্ষণ করল। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা লীগ পরাজিত হয় যদিও তিনি পৃথক মুসলিম ভোটার শ্রেণি তৈরি করেছিলেন

তাও কিছু করে উঠতে পারলেন না। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের সংসদ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৭ সালে শরিয়াত আইন পাস করল যা সেই সময় লীগের বড় সাফল্য হিসাবে পরিগণিত হল।

কিন্তু শরিয়াত আইন পাস হওয়ার ফলে নারীরা সম্পত্তির অধিকার পেল যা তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মেনে নিতে পারেনি। পাঞ্জাবের মুসলিম ভূমিধারীরা শরিয়াত দ্বারা নারীকে সম্পত্তির অধিকার প্রদানে উদ্বিগ্ন হয়েছিল। কারণ সব ধর্মের পাঞ্জাবী নারীরাই সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে জিন্নাহ শেষপর্যন্ত একটি সমঝোতা করে সেখানে কৃষিজমিকে শরিয়াত আইনের পরিপ্রেক্ষিতে বাদ দিয়ে দেন। অর্থাৎ আইনটিকে লিঙ্গভিত্তিক (gendred) করে দেওয়া হল, লিঙ্গ সমতার দিক থেকে আইনটি পক্ষপাতিত্ব করেছিল।

১৯৩৯ সালে লীগ মুসলিম বিবাহ আইন সংস্কার করে মুসলিম মেয়েদের দিয়েছিল বিবাহ বিচ্ছেদ নেওয়ার অধিকার। স্বাধীনতার পর ১৯৩৭ সালের মতই মুসলিম আইন ধর্ম সম্পর্কিত ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনৈতিক অস্ত্রও ছিল। ভারতে সংখ্যালঘু হবার জন্যই মুসলিমরা প্রায়শই ব্যক্তিগত আইনকে নিজেদের ধর্ম পরিচয়ের অংশ হিসাবে দেখে। পরিচয়ের এই বিভ্রান্তির জন্যই প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিকে ব্রিটিশরা ব্যক্তিগত আইনে মধ্যস্থতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভারতের ক্ষেত্রে ইসলাম গড়ে ওঠার পিছনে রুপান্তর বিদ্যমান ছিল, অমুসলিম থেকে মুসলিম হয়ে ওঠার যাত্রাপথ ছিল দীর্ঘ ও ধীর[১৬]।

ইসলামে নারী : ইসলাম আগমনের পর নারীদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, তাদের দিয়েছে শরিয়াতসম্মত অধিকার, যা সমাজে তাদের অবস্থানকে উন্নত ও সুদৃঢ় করেছে। মানুষ হিসেবে নারীর সাধারণ অধিকার গুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়, যথাক্রমে-

(১) আধ্যাত্মিক অধিকার– চোদ্দশো বছর আগেই ইসলাম নারীদের আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কোরানের বর্ণনা অনুসারে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বিদ্যমান এবং পুরুষের মতো নারীও নিজ প্রচেষ্টা ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক

উন্নতির পর্যায়ে পৌছতে পারবে। কোরানের বিভিন্ন সুরা যেমন- আল নাহল, আল ইসরা, নিশা, আর-রুম, তাওবা, আশুরাতে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া আছে।

(২) অর্থনৈতিক অধিকার– আজ থেকে তেরোশো বছর পূর্বেই ইসলাম নারীদের দিয়েছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। যার ফলে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত সব ধরনের মহিলারাই কারো সম্মতি ছাড়াই সম্পত্তি কেনা-বেচা, দান করা, বন্ধক দেওয়া ইত্যাদি করতে পারত এবং স্ব- উপার্জিত অর্থ নিজ ইচ্ছাতে কাউকে কৈফিয়ত না দিয়েই খরচ করতে পারবে। বাবার সম্পত্তিতে পুত্রসন্তানের ন্যায় কন্যাসন্তানের ও অধিকার স্বীকৃত করেছে ইসলাম। যদিও লিঙ্গ সাম্যের দৃষ্টিতে তা সমান নয় তাও বলা যায় তৎকালীন সময়ে এই ওইটুকুই ছিল বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। কোরানে সুরা বাক্কারা, নিশা, মায়েদাতে এব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে মাত্র কয়েকশো বছর আগে ১৪৭০ সালে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম বিবাহিত নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

আইন থাকলেও আমাদের সমাজে বেশীরভাগ নারীরা আজও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। বাবার মৃত্যু হলে বেশিরভাগ সময় কন্যাদের বাবার সম্পত্তি থেকে বেদখল করে দেওয়া হয়। আবার বিয়েতে খরচ হয়ে গেছে এই কারণ দেখিয়েও সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়।

(৩) সামাজিক অধিকার– সামাজিক দিক থেকে নারীর অধিকারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও ভগিনী হিসাবে। ইসলামে কন্যাভ্রূণ হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুরা তাকইম, আল নাহল, তিরমিজি হাদিস ২য় খণ্ডতে এবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু বর্তমান সময়েও যদি আমরা নারী পুরুষের লিঙ্গ অনুপাতের দিকে লক্ষ করি তাহলে পরিসংখ্যানে দেখতে পাব- পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা কমতেই থাকছে এবং এটা সব সম্প্রদায়ের নারীদের জন্যই প্রযোজ্য।

স্ত্রীর মর্যাদাতে বলা হয়েছে, ‘তোমাদের(পুরুষ) মধ্যে উত্তম সেই ব্যাক্তি যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম’। সহিহ হাদিস, সুরা বাক্কারা, নিশা তে স্ত্রীর অধিকার এর বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে।

কিন্তু আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীকে বিয়ে করা দাসী ছাড়া আর কিছুই ভাবা হয় না। সংসার সামলানো, পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালন তার কর্তব্য। কিন্তু তার অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে কেউই ওয়াকিবহল নয়। গার্হস্থ্য হিংসা আমাদের সমাজের একটি সাধারণ ইস্যু।

মাতা হিসাবে ইসলাম নারীকে দিয়েছে সর্বোচ্চ স্থান। বলা হয়েছে, ‘মায়ের পায়ের নিচে সন্তানদের জান্নাত, সম্মান কর সেই গর্ভকে যা তোমাকে বহন করেছে’। সুরা নিশা, আনম, লোকমান, আহকাফ ও বিভিন্ন হাদিসে মায়ের অধিকার বর্ণনা করা আছে।

কিন্তু আজ আমাদের সমাজে বয়স্ক পিতামাতাদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায় সন্তানেরা। সম্পত্তির জন্য পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করতেও পিছপা হয় না।

বোন সম্বন্ধে সুরা তাওবাতে বলা হয়েছে নারী ও পুরুষ একে অপরের ভরণপোষণকারী ও সমর্থক। এখানে সমর্থক মানে শুধু রাজনীতিতে নয় সমাজ জীবনেও বলা হয়েছে। নবী করিমের মতে, নারীরা হল শাকাত(shakat) -যার মানে হল বোন। এটার অন্য একটা মানে হল অর্ধেক (half), যেমন মানব জাতি নারী ও পুরুষ এই দুই ভাগে বিভক্ত, সংক্ষেপে ভাই ও বোন –এখানে অর্ধেক হল বোন। এছাড়াও ইসলাম ধর্মে বোনের সাথে মধুর ব্যবহার ও মানবিক আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৪) শিক্ষার অধিকার– মানব জাতির প্রতি কোরান শরীফের প্রথম নির্দেশনা ছিল ‘পড়’। কোরানের প্রথম পাঁচটি আয়াতে বলা হয়েছে ‘পড়, মুখস্ত কর, প্রচার কর’। সুরা আলক/ইকরাতে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। খলিফা শাসন কালে ফাতিমা আল ফিহারিয়া নাম্নী মহিলা ৮৪১(CE) তে মরক্কোয় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বিজ্ঞানের মতো বিষয় ছাড়াও আরো অন্যান্য বিষয়ও পড়ানো হতো সেখানে। ১৮২১ সালে আমেরিকায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হলেও মহিলারা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়নি। শেষপর্যন্ত দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৮৪১ সালে সাধারণ ভাবে নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

তাও আমাদের দেশে রক্ষণশীল সমাজে শরিয়াত, পর্দা ইত্যাদির অজুহাত দেখিয়ে নারীদের গতিময়তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, পরনির্ভরশীল করে রাখার জন্য তাদের শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখা হয় এখনও।

(৫) আইনি অধিকার– ইসলামিক আইনি বিধান অনুযায়ী নারী ও পুরুষ সমান। অর্থাৎ কোনো একই অপরাধমূলক কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলা একই ধরনের শাস্তি পাবে। অনুরূপ ভাবে কোন ভালো কাজের জন্য তারা একই ধরনের পুরস্কার পাবে। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে লিঙ্গের বিভেদতার কারণে শাস্তি বা পুরস্কারে বিভেদ করা হবে না। সূরা বাক্কারা, মায়েদা, আন-নূর এ নারীর আইনি অধিকার বিশ্লেষণ করা আছে। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে নারীদের মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না, সেখানে তার আইনগত অধিকার যে থাকবেনা তা একেবারে স্বীকৃত সত্য।

আজও অশিক্ষা, কোরান না বোঝার জন্য নারী তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, ফলত নিজের উপর হওয়া অন্যায়, অবিচারের প্রতিকার ও তারা আইনের সাহায্য নিয়ে চাইতে পারে না।

(৬) রাজনৈতিক অধিকার – ইসলাম অনুযায়ী নারী পুরুষ একে অপরের সমর্থক শুধুমাত্র সামাজিক ভাবেই নয় রাজনৈতিক ভাবেও(সূরা তাওবা)। সূরা মুমতাহিনা অনুযায়ী বিশ্বাসী মহিলারা রাসুলের কাছে আসত তাঁর আনুগত্যের শপথ নিতে। আরবি ভাষায় বায়ান বলে একটা কথা আছে যার মানে আজকের দিনের নির্বাচনের সমতুল্য। কারণ রাসুল ধর্মীয় প্রধান হওয়ার সাথেই রাষ্ট্রেরও নেতা ছিলেন এবং মহিলারা তাঁর কাছে আসতেন ও তাঁর রাষ্ট্রের মাথা হওয়াকে সমর্থন জানাতেন। একটি হাদিস অনুযায়ী হজরত উমার (আ.) একদিন সাহাবাদের সাথে আলোচনা করে মেহের এর সীমা নির্ধারণ করছিলেন যাতে যুবক

পুরুষরা বিয়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত না হয়ে পরে। তখনই পিছন থেকে একজন মহিলা আপত্তি জানিয়ে কোরআনের সূরা নিশা আয়াত ২০ তুলে ধরে বলেন- তুমি দেবে একগুচ্ছ সম্পদ, একগুচ্ছ সোনা মেহের হিসাবে। যেখানে কোরান মেহের এর কোন সীমা নির্ধারণ করেননি, তাহলে কে এই উমার যে মেহের নির্ধারণ করছে। তৎক্ষণাৎ উমার বলেন তিনি ভুল এবং মহিলাটি ঠিক। এইভাবেই যে কোন নারী নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনটা ভোগ করত তা সে খলীফার বিরুদ্ধে হলেও[১৭]।

কিন্তু আমাদের দেশে সংবিধান সংশোধনের দ্বারা আসন সংরক্ষণ করে নারীদের নির্বাচনের আঙিনায় নিয়ে আসা হলেও তারা নিজেদের মতাদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিবহল নয়। তাছাড়া রাজনীতিকে পুরুষের বিচরণ স্থল মনে করে নারীদের ওখান থেকে দূরে রাখা হয়। রাজনীতিতে ভালো পরিবারের মেয়েরা যায় না- এ ধরনের উক্তি আমাদের সমাজে ভেসে বেড়ায় অর্থাৎ মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়না।

কোরান শুধুমাত্র মানুষ হিসাবে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে তা নয় উপরন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে উন্নত করার জন্যও কিছু অধিকার মঞ্জুর করেছে। সেগুলি হল-

(ক) কর্মসংস্থানের/উপার্জনের অধিকার– ইসলামি মূলনীতির পরিপন্থী নয় এমন সকল কাজই মহিলারা করতে পারবে এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমহারেই মজুরি পাবার দাবিদার। নারী বলে মজুরি বৈষম্য করা ইসলামে জুলুম বলে পরিগণিত হবে। যোগ্যতা সম্পন্ন ও সুযোগপ্রাপ্তা মেয়েদের নানাবিধ পেশায় নিযুক্ত হওয়া শুধু জায়েজই নয় কর্তব্য হিসাবে বিবেচ্য। কোরানে আল্লাহ বলেছেন –‘আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে একে অন্যের থেকে বেশি দান করেছি, তাঁর প্রতি তোমরা লোভ করো না। পুরুষ যা কিছু অর্জন করে সেই অনুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট এবং নারী যা কিছু অর্জন করে সেই অনুযায়ী তাদের অংশও নির্দিষ্ট, আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর কাছেই জানাতে হবে। নিঃসন্দেহে তিনি সব বিষয়ে জ্ঞানী’ (নিশা:৩২)। উদাহরণ হিসেবে হযরত আসমা (রা.) -এর কথা বলব যিনি নিজেই তৎকালীন যুগের সম্মানিত ব্যক্তি যুবায়েরের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নয় মাইল হেঁটে

কর্মক্ষেত্রে যেতেন এবং খেজুরের দানা মাথায় করে ফিরে আসতেন। একজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা জীবিকার জন্য বাইরে যেতে চাইলে লোকে গালমন্দ দিতে শুরু করে। কিন্তু রাসুল তা জানতে পেরে তাকে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেন, বলেন মহিলা যদি তাঁর অর্থনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে তবে সে তাঁর সংগৃহীত অর্থ সৎকাজে ব্যয় করতে পারবে এবং মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারবে (সহিহ বুখারি)[১৮]।

কিন্তু মুসলিম মহিলাদের কর্মসংস্থানের ওপর রাশ টানার জন্য তাদের উপর পর্দা(বোরখা) চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হতে পারে ও পুরুষের নিয়ন্ত্রণে পরনির্ভরশীল থাকে। পর্দার দোহায় দিয়ে তাদের গৃহবন্দি করে পুনরুৎপাদনমূলক কাজে আটকে দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও যে কোনো দেশের কোনো জায়গার নিম্ন আয়ের, নিম্নশ্রেণির নারীরা পর্দার তোয়াক্কা না করেই কর্মজগতে যোগ দিয়েছে। যেমন-বাংলাদেশি গ্রামীণ মহিলারা পর্দার শোভনতা সম্পর্কে ততটা সচেতন নয় তারা প্রয়োজনে পরিযায়ী হয়েও কাজে নিযুক্ত হয়েছে।

(খ) মেহের পাওয়ার অধিকার– যেহেতু আরবরা ছিল ব্যবসায়ি শ্রেণির তাই চুক্তিতে তারা পারদর্শী ছিল। আর চুক্তির মৌলিক নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কগুলিতে যার মধ্যে বিয়েটাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও শরিয়াত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে তাও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে নয়। চুক্তিবদ্ধ বিয়ের এই নীতিতে রাসুল উপজাতীয় আরবের বধূমূল্যকে মেহের এ রূপান্তরিত করে দেন তার ভবিষ্যৎ সুরক্ষা হিসেবে। কোরান অনুযায়ী, ‘নারীদের বিবাহের উপহার স্বরূপ মেহের দিতে বলা হয়েছে, বিবাহ সিদ্ধ করার জন্য মেহের প্রদান আবশ্যক’(নিশা:৪)। এমনকি পূর্ণ দেনমোহর আদায় না করলে বধূ স্বামীর ঘরে যেতে অস্বীকার করতে পারে। এর জন্য তাকে কেউ জোরজবরদস্তি করতে পারে না এমন কি পুরুষ দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা হলেও মেহের ফেরত দিতে হয় না। মালে কি আইন অনুযায়ী মেহের কমপক্ষে দশ দিরহাম হওয়া চাই[১৯]।

কিন্তু আমাদের সমাজে কোরানের মর্যাদা রক্ষার জন্য নাম মাত্র মেহের যেমন- ১৫১ টাকা, ৭৮৬ টাকা দেওয়া হয়। যেখানে বিয়েতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করা হয় বিয়ের সাজসজ্জা, ফুল, নৈশভোজ, বউভাত ইত্যাদিতে। আবার অনেক সময় পরিবারে অতীত থেকে চলে আসা নিয়ম অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত একই পরিমান মেহের দেওয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ তখন একশো টাকা দিলে এখনও তাই দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়া পণপ্রথা যার মাধ্যমে যতনা মেহের দেওয়া হয় তাঁর থেকে অনেক গুণ বেশি পণ নেওয়া হচ্ছে আমাদের সমাজে। কিন্তু ইসলামে পণের দাবি করা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ -দুইভাবেই নিষিদ্ধ।

(গ) জীবনসাথী পছন্দ করার অধিকার – ভবিষ্যৎ জীবন কার সাথে অতিবাহিত করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একজন মুসলিম নারীর রয়েছে। বলা হয়েছে যে কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া এবং বিধবা নারীকে তার মতামত ব্যতিত বিয়ে দেওয়া যাবে না (সহিহ হাদিস:৬৯৭০)। রাসুলের যুগে একটি মেয়েকে বিনা অনুমতিতে তার পিতা আপন ধনবান ভ্রাতৃপুত্রের সাথে বিয়ে দিলে মেয়েটি রাসুলের কাছে অভিযোগ জানায়। তিনি মেয়েটিকে বলেন এই বিয়ে রক্ষা করা বা না করা সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছাধীন। হাদিশ শরিফের বর্ণনা অনুযায়ী একবার নবী করিম নিজে কিছু সংখ্যক মেয়েদের পাঠালেন এবং বললেন যাও ওই লোকগুলিকে দেখে এসো ওদের সাথে তোমাদের বিয়ের কথা হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি নিজেই স্বামী নির্বাচনে নারীদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন[২০]।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব মত ও পছন্দ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী পছন্দ করার কোন স্বাধীনতাই নেই। ফলস্বরূপ কোন মহিলা যদি এই ধরনের কাজ করার স্পর্ধা দেখায় তার জীবনে নেমে আসে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন। যেমন- অনার কিলিং, ধর্ষণ ও ধর্ষণের হুমকি, জোরপূর্বক অন্যত্র বিবাহ ইত্যাদি।

(ঘ) তালাক-এ-তাফইজ নেওয়ার অধিকার– শুধুমাত্র পুরুষরাই নয় নারীরাও উপযুক্ত ও বৈধ কারণ দেখিয়ে তালাক নিতে পারে। স্বামী কাবিননামার ১৮ নং ঘরে সম্মতি প্রদানের

মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পিত করেছে কিনা? করে থাকলে কি শর্তে? এই ঘরটিতে হ্যাঁ লেখা থাকলেই স্ত্রী তালাক প্রদানের ক্ষমতা পায়। **১৯৬১** সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে আট ধারা মোতাবেক তালাকের অর্পিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্ত্রী স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ নিতে পারে এবং সাত ধারা উল্লেখিত সমস্ত বিধান উক্তক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে[২১]।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হল আমাদের সমাজের মহিলারা কোরান পড়লেও তা না বুঝে পড়ার জন্য এ সম্বন্ধে এখনও অবগত হয়নি,যার ফলস্বরূপ তারা আজও অধিকার বঞ্চিত। **১৯৩৭** সালের ডিশলিউসন অব মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ীও এদেশে বিচ্ছেদের হার খুব কম। কারণ আমদের সমাজের সিংহভাগ মহিলারাই অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভরশীল নয় ফলত আইন থাকলেও সহজে বিচ্ছেদ নিতে চায় না। এছাড়াও কাবিননামা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার ফলেও তারা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

(ঙ) পদবি পরিবর্তন না করার অধিকার– শরিয়াত আইন অনুসারে একজন মুসলিম নারী বিবাহ পরবর্তী জীবনে নিজের পিতৃপদবি ব্যবহার করবে নাকি স্বামীর পরিচয় গ্রহণ করবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তার নিজের। ইসলামে বিয়ের পরও নারীর বংশমর্যাদা, ব্যক্তিস্বাধীনতা অব্যাহত থাকে। কোরানে বলা হয়েছে – 'তাদের(স্ত্রী) ডাকো বাবার পরিচয় দিয়ে' (আল-আহজাব : ৫)। অন্যত্র বলা হয়েছে- কাওকে যদি অন্য পরিচয়ে ডাকা হয় তাহলে তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ হয়ে যাবে (বুখারি:৪০৭২)। নবীজির কোন স্ত্রীর সাথেই তার নাম যুক্ত করা হয়নি, সবাই তাদের পিতার পরিচয়েই পরিচিত ছিল[২২]।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে দীর্ঘ আন্দোলনের পর সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায়দান করেছে যে, বিবাহিত মহিলারা স্বামীর পদবি ব্যবহার করবে নাকি বিবাহপূর্ব পরিচয় বহন করবে তা সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

কিন্তু বিবাহিত মুসলিম নারীরা বিশেষত বাঙালি মুসলিম নারীরা আপনা আপনিই বিয়ের পর বিবি অথবা বেগম পদবিতে ভূষিত হয়ে যান। তারা জানেই না যে বিয়ের পর পদবি পরিবর্তন না করার অধিকার তাকে ইসলাম প্রদান করেছে।

(চ) যৌথ বা এককভাবে না থাকার অধিকার– দার উল মুখতার-এ ইমাম হাসকাফি বলেছেন, আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী একজন স্বামীর বাধ্যতামূলক ভাবে উচিৎ তাঁর স্ত্রীর জন্য আলাদা আশ্রয় প্রদান করা যেটা তার(স্বামীর) পরিবার ও পারিবারিক সদস্যদের থেকে আলাদা হবে। বাড়ির মধ্যেই একটি আলাদা অংশ যেখানে থাকবে একটি আলাদা বাথরুম, রান্নাঘর আটক (lock) -এর সুবিধা যুক্ত, এটাই নুন্যতম রূপে পর্যাপ্ত।

এ প্রসঙ্গে হাসকাফি-র বক্তব্য, আলাদা বাথরুম, রান্নাঘর –এই ব্যাপারটি এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে আলাদা মানে তৈরি করে। যেমন গরিব পরিবারে যেখানে বাথরুম, রান্নাঘর এই সমস্ত অংশগুলি সাধারণত পরিবারের সদস্যদের সাথে একসঙ্গে ভাগ করে ব্যবহার করে, তাদের জন্য খুবই কঠিন আলাদা জায়গার ব্যবস্থা করা। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য এইটুকুই পর্যাপ্ত হবে যে তারা যেন আটক করার ব্যাবস্থা সহ আলাদা অংশের ব্যাবস্থা করে[২৩]।

কিন্তু বাস্তব সত্য হল নারীর নিজস্ব কোনো বাড়িই নেই। বিবাহের আগে বাবার বাড়ি, বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ি হল তার বাসস্থান। ভার্জিনিয়া ওলফ তার লেখা বই *A Room Of Ones Own* এ নারীর নিজস্ব, ব্যক্তিগত কক্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছিলেন। এই বাক্যটি ব্যবহার করেই নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গে নারীর নিজস্ব বাসস্থানের দাবি তুলে ধরা হয়েছিল।

ইসলামের ভিতরে সংস্কার : যদিও ইসলামিক আইনটি ঐক্যবদ্ধ বলে মনে হলেও বিভিন্ন দেশে ইসলামিক বা অন্যান্য যাইহোক না কেন পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার চাহিদা পূরণের জন্য আইন সংশোধন করেছে। এই পরিবর্তন কিন্তু সমান্তরাল ছিল না। যেমন আরবের মতো ইসলামিক দেশে এখনও অবিধিবদ্ধ মুসলিম আইনকে সংরক্ষণ করেছে যেমনটা স্থানীয় ভাবে অনুসরণ করে। আবার অন্যদিকে তুর্কী, আলবেনিয়া-র মতো দেশে ইসলামিক প্রথাগত আইনকে সংশোধন করে ধর্মনিরপেক্ষ আইনে পরিবর্তন করেছে। বিংশ শতাব্দী ধরে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলামিক প্রথাগত আইনকে সংশোধন করা হয়েছে। ইসলামিক বিভিন্ন স্কুলগুলির মধ্যে মালিকি আইন মহিলাদের বেশি সপক্ষে, তার পরেই আছে হানাফি

স্কুল। উত্তর আফ্রিকা মালিকি আইন অনুসরণ করে ফলে ওখানকার নারীরা বৃহত্তর অধিকার ভোগ করে। এই আইনের ফলে ওখানকার স্ত্রীরা কয়েকটি কারন যথা- নিষ্ঠুরতা, ভরণপোষণে ব্যার্থতা, নিরুদ্দেশ, উন্মাদ, কুষ্ঠরুগী, খোজা, যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত ইত্যাদির কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে।

(১) তিউনিসিয়ায় **১৯৫৭** সালে law of personal status অনুযায়ী বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নারী পুরুষ উভয়েই এইকাজ করলে এক বছরের কারাদণ্ড অথবা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা হবে অথবা অবস্থা অনুসারে উভয় দণ্ডই হবে। একই আইনে ৩০ নং ধারায় আদালতের বাইরে যে কোন তালাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

(২) **১৯৫৯** সালে আলজেরিয়ায় তালাক সংক্রান্ত নতুন আইনের দ্বারা আদালত যুক্তিসংগত কারণে স্বামীর অনুকূলে তালাকের অনুমতি প্রদান করতে পারেন। অন্যদিকে স্ত্রী যদি চায়, তাহলে তাকে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে। অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার।

(৩) **১৯৫৮** সালে মরক্কোয় বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। যদি আদালত মনে করে যে, বহুবিবাহের ফলে স্বামী তার স্ত্রীদের প্রতি সৎ আচরণ করতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে আদালত দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান নাও করতে পারে।

(৪) **১৯৫৯** সালে ইরাকে law of personal status জারি করা হয়। এই আইনানুযায়ী কাজী কোন ব্যক্তিকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান করবেন না যদি না তিনিই এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, (ক) দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে তার আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে, (খ) এক্ষেত্রে তার আইনসঙ্গত উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে, (গ) স্ত্রীদের মধ্যে কোন বৈষম্য হবে না।

(৫) **১৮৬৫** সালে পারস্য বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ আইন-এ বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত আইনে বলা হয়েছে কোন স্বামী তার স্ত্রী জীবিত অবস্থায় অপর কোন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রীও বৈধ বিবাহ এবং

বর্তমান স্বামী জীবিত অবস্থায় অপর কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।

(৬) তুরস্কে সাইপ্রাস সংক্রান্ত আইন বিধিতেও বহুবিবাহের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধি বিধানের মর্ম কথা হল এ ধরনের সকল বিবাহ অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিও প্রমাণিত হয় উক্ত বিবাহের দিনও স্বামী বা স্ত্রী বৈধ বিবাহ অব্যাহত।

(৭) তুরস্ক সিভিল কোর্টে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি (নারী বা পুরুষ) ততক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোর্টে প্রমাণ করতে সমর্থ হচ্ছে যে,

- ইতিপূর্বে বিবাহ বাতিল, মৃত্যুজনিত কারণে অথবা চিরস্থায়ী অবসান হয়েছে।
- সমবিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারের আওতায় পরস্পর বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেছে।
- আদালত কর্তৃক বিবাহবন্ধন অবসান হয়েছে।

(৮) সোভিয়েত ইউনিয়নের তাজিকিস্থানসহ সকল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ধরনের আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত আইন ও বিবাহ সম্পূর্ণ নিসিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। বিবাহ ও বিবাহবিছেদের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকারের বিধিবিধান দীর্ঘকাল যাবত কার্যকর।

(৯) গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে সব মুসলিম নারীদের জন্য এক এবং অভিন্ন বিধিবিধানের রেওয়াজ দীর্ঘকাল যাবত কার্যকর। বর্তমান বৈধ বিবাহ অব্যাহত থাকা কালে কোনভাবেই একাধিক স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণের ব্যবস্থা আইনে স্বীকৃত নয়।

(১০) ১৯৭৫ সালে ইন্দোনেশিয়া বিবাহ আইন: ১৯৭৫ সালের ১লা অক্টোবর থেকে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার এর ভিত্তিতে আইন প্রচলন করা হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সকল বিবাহের নিবন্ধিকরন বাধ্যতামূলক।

নীতিগত ভাবে পুরুষ বা নারী এক স্ত্রী বা এক স্বামী গ্রহণ করবে অর্থাৎ বহুবিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হল।

ইসলামিক বিভিন্ন স্কুল গুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েও বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত আইনে সংস্কার করা হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানে হানাফি আইন প্রচলিত তাও **১৯৩৯** সালের বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে মালিকি আইনের নীতি মেশানো হয়েছে। একইভাবে হানাবালি আইনের ব্যবহার করে অনেক রাষ্ট্রে মহিলারা তাদের স্বামীদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পেরেছে। **১৯৬১** সালে পাকিস্তানে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে পুরুষের বহুবিবাহকে স্বীকার করা হলেও এর জন্য পুরুষদের arbitration council এর অনুমতি নিতে হবে। এইভাবেই বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত আইনে সংস্কার আনা হয়েছিল[২৪]। ভারতের ক্ষেত্রে শরিয়াত আইন এখনও হিমায়িত (frozen) হয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে ভারতের উচ্চ ন্যায়ালয় তাৎক্ষণিক তিন তালাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, কিন্তু পারসোনাল ল বোর্ড তা অস্বীকার করে। যদিও তারা তিন তালাক ব্যবহারকারীদের সামাজিকভাবে বয়কট করলেও কোন আইন প্রণয়ন করতে দিচ্ছেনা। কারণ তারা ভাবছে এই প্রক্রিয়ায় সরকার আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে। মুসলিম পারিবারিক আইনের সংস্কারের জন্য আন্দোলন চলছে এদেশেও।

তথ্যসূত্র:

১। https://www.barghouti.com>islam>meaning, Retrieved on 9 April, 2019.

২। *কোরআন শরীফ*, মহঃ শরীক এন্ড সন্স, দিল্লী, ১৯৭৬, পারা নং- ১-১৭

৩। https://www.2nau.edu>bio301>context> iscrst., Retrieved on18 April, 2019

৪। *কোরআন শরীফ*, মহঃ শরীক এন্ড সন্স, দিল্লী, ১৯৭৬, পারা নং- ১৪

৫। https://www.explorethemed.com>riseislam,retrived on 11april, 2019

৬। আলম, গউছুল, *মুসলিম আইন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৯, পৃ: ৮

৭। ওয়াহাব, ড. আব্দুল, *বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত*, রত্নাবলী প্রকাশন, কলকাতা ১৯৯৯, পৃ: ৯১

৮। https://en.m.wikipedia.org.wiki.islam, retrived on 18 April, 2019

৯। আলম, গউছুল, *মুসলিম আইন*, বাংলা একাডেমি’, ঢাকা, জুন ২০০৯, পৃ:-৩০

১০। Fayzee, A.A.A. *Outlines Of Muhammedan Law*, Tahir Mahmood (Editor), (Delhi: Oxford University Press, 2018), p-39-40

১১। Agnes, Flavia; Chandra Sudhir Basu, Monmayee, *Women And Law In India*, Oxford University Press, 2016, new delhi, p-29-31

১২। আলম, গউছুল, *মুসলিম আইন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৯, পৃ.-৩৪-৩৮

১৩। Fayzee, A.A.A, *Out Lines Of Muhammedan Law*, Editor-Tahir Mahmood, Oxford University Press, 2018, p-65

১৪। Thapar, Romila, *A History Of India*, Volume-1, Penguin Books, 1990, p-298-312

১৫।https://www.feministezine.com/feminist/modern/India-Gender-Community.html,retrived on 11 April 2019

১৬। https://Scroll.in>article>a-short....,retrived on 18 April 2019

১৭। Naik, Dr. Zakir,'Women's Rights in Islam– Modernising or Outdated' https:// www.institutealislam.com.>wome...,accessed on 11 may 2019

১৮। রহীম, মাউলানা মুহাম্মাদ আবদুর, *নারী,* খাইরুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ.-৫

১৯।*কোরআন শরীফ,* মহঃ শরীক এন্ড সন্স, দিল্লী, ১৯৭৬, পারা নং- ৪

২০। রহীম, মাউলানা মুহাম্মাদ আবদুর, *নারী,* খাইরুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ.-৫১

২১। https://www.Slideshare.net>rkubby>talaq,retrive on 12 april, 2019

২২। *সহিহ বুখারি,* হাদিস নং ৪০৭২, খণ্ড-৪, ইসলামিক বুক সার্ভিস, ২০০৫

২৩। ইবন, আবিদিন, *রাদ-আল-মুখতার আলাদার- অল মুখতার,* খণ্ড-৩, বেটাস্ক্রিপ্ট প্রকাশনা, ২০১০, পৃ: ৫৫৯-৬০০

২৪। *নারীর আইনি অধিকার,* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুন, ২০০০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে নারীর অধিকার ও আইন

দীর্ঘ দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে[১]। ১৯৫০ সালে ২৬শে জানুয়ারী আমাদের সংবিধান কার্যকরী হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা আছে, যে ভারতীয় নাগরিকদের প্রতিজ্ঞা যে ভারতবর্ষ হবে একটি সার্বভৌম সমাজতান্তিক ধর্মনিরপেক্ষ গনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যা অর্জনের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে দিতে হবে ন্যায়- সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক, স্বাধীনতা-চিন্তার, অভিব্যক্তির, বিশ্বাসের ও প্রার্থনার, সমানাধিকার- অবস্থান এবং সুযোগের এবং সকলের মধ্যে জাগাবে ভাতৃত্ববোধ যাতে ব্যক্তির সম্মান এবং দেশের ঐক্য ও সংহতি অটুট থাকে। ভারতে সাংবিধানিক ভাবে মহিলাদের জন্য সাম্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মুক্ত ভারতের প্রথম নেতা জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন- তুমি একটি জাতির অবস্থা বলে দেবে তাদের নারীদের অবস্থান দেখে। সংবিধানের উপরিউক্ত প্রতিজ্ঞা পালনের উদ্দেশ্যে কিছু অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশের ১২-৩৫ নং অনুচ্ছেদের মধ্যে মৌলিক অধিকারগুলি বিবৃত করা আছে। সার্বজনীন ভাবে সমস্ত নাগরিকদের ওপর, শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও জন্মস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করা যায়। ভারতীয় দণ্ডবিধির এবং অন্যান্য আইনগুলি এই অধিকার লঙ্ঘন করার জন্য বিচার বিভাগের বিবেচনার ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করে। যদি ও অধিকারগুলি সংবিধান প্রদত্ত এবং ভারতীয় বিচারব্যবস্থা কর্তৃক রক্ষিত হয় তাও ভারতীয় বিচারব্যবস্থা দ্বারা অধিকার লঙ্ঘনের জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ধারা ৩২ এর দ্বারা চূড়ান্ত বিচারের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১.১। ছয় ধরনের মৌলিক অধিকার সংবিধান অনুযায়ী চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করা হল-

১। সমতার অধিকার (অনুচ্ছেদ, ১৪-১৮) : সমতার অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে আইনের চোখে সমতা, শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ অথবা জন্মস্থানের নিরিখে বৈষম্য প্রতিহত করা এবং কাজের জগতে সমসুযোগ প্রদান, অস্পৃশ্যতা ও পদবির নির্মূলকরণ ইত্যাদি।

২। সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষাগত অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৯-৩১) : সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার অধিকারের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের নিজস্ব সংস্কৃতি, রীতিনীতি, সংরক্ষণের অধিকার এবং তারা যাতে বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে তাঁর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

৩। স্বাধীনতার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৯-২২) : স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে আছে বাক এবং মত/অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশ, সমিতি বা ইউনিয়ন বা সমবায়, আন্দোলন, বাসস্থান এবং কোনো পেশা বা পেশা অনুশীলন করার স্বাধীনতা।

৪। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৩-২৪) : শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের মধ্যে আছে বাধ্যতামূলক শ্রম, শিশুশ্রম এবং মানব পাচার নিষিদ্ধ করার ঘোষণা।

৫। স্বাধীনভাবে ধর্মাচারণের অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৫-২৮) : ধর্মের স্বাধীনতার অধিকারে রয়েছে বিবেক ও মুক্তপেশা অনুশীলন, ধর্মের প্রচার, ধর্মীয় বিষয়গুলি পরিচালনা করার স্বাধীনতা, নির্দিষ্ট করের স্বাধীনতা এবং কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ধর্মীয় নির্দেশনা থেকে স্বাধীনতা। সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার তাদের সংস্কৃতি, ভাষা বা স্ক্রিপ্ট সংরক্ষণের অধিকার দেয় এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার দেয় তাদের পছন্দ মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার।

৬। সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩২-৩৫) : সমস্ত মৌলিক অধিকারগুলি থেকে ভারতীয় নাগরিকরা যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য সাংবিধানিক প্রতিকারে সবার জন্য অধিকার রক্ষিত করা হয়েছে।

১.২। ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত নারীর অধিকার ও সুরক্ষাগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হল -

১। আইনের চোখে সাম্যতা (অনুচ্ছেদ ১৪)।

২। ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ অথবা জন্মস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না (অনুচ্ছেদ ১৫(১))।

৩। শিশু ও মহিলাদের জন্য রাষ্ট্রের বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা (অনুচ্ছেদ ১৫(৩))।

৪। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান (অনুচ্ছেদ ১৬(২))।

৫। জীবিকা ও পর্যাপ্ত জীবনধারণের পক্ষে মহিলা ও পুরুষের সাম্যবাদী নীতি প্রবর্তন (অনুচ্ছেদ ৩৯(৩))।

৬। নারী পুরুষের সমান কাজের জন্য সমান বেতন বা পারিশ্রমিক প্রদান করা (অনুচ্ছেদ ৩৯(D))।

৭। সমান সুযোগের ভিত্তিতে বিচার প্রদান করা এবং উপযুক্ত আইন ও নীতির মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা প্রদান করা, যাতে অর্থনৈতিক কারণ বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা হেতু বিচার পেতে কোন নাগরিকের সুযোগের অভাব না ঘটে (অনুচ্ছেদ ৩৯(A))।

৮। কাজের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান এবং মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা প্রদান করা (অনুচ্ছেদ ৪২)।

৯। সমাজে পিছিয়ে পড়া এবং দুর্বল শ্রেণীর জন্য রাষ্ট্রের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ যত্নশীল হওয়া এবং তাদের সামাজিক অন্যায় ও বিভিন্ন ধরনের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা (অনুচ্ছেদ ৪৬)।

১০। পুষ্টি ও জীবনমান উন্নীত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা (অনুচ্ছেদ ৪৭)।

১১। ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং মহিলাদের সম্মানের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রথাগুলি বর্জন করা (অনুচ্ছেদ ৫১-A(e))।

১২। তপসিলি জাতি-উপজাতি ছাড়াও মোট পঞ্চায়েতে আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ২৪৩-D(৩))।

১৩। পঞ্চায়েতে মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলা চেয়ারপার্সনদের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ২৪৩ D(৪)।

১৪। পৌরসভা এলাকাগুলিতে মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ২৪৩ T(৩))।

১৫। পৌরসভা এলাকাগুলিতে মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলা চেয়ারপার্সনদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে (অনুচ্ছেদ ২৪৩ –T(৪)[2]।

১.৩। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড যা ব্রিটিশ শাসিত ভারতে **১৮৬০** খ্রিঃ বলবৎ হয় এবং বর্তমানেও তা কার্যকর রয়েছে। এই কোড অনুযায়ী নারীর প্রতি হওয়া অপরাধকে সাতভাগে ভাগ করা যায় এবং কোড অনুযায়ী দোষীদের শাস্তির বিধান ও দেওয়া রয়েছে। সেগুলি হল যথাক্রমে- ধর্ষণ, অপহরণ ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য পাচার করা, শ্লীলতাহানি, যৌনহয়রানি ও ইভটিজিং, পণপ্রথা জনিত হত্যা, শারীরিক ও মানসিক ভাবে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা, একুশ বছর বয়স অবধি মেয়েদের পাচার বা চালান ইত্যাদি।

ক। ধর্ষণ (I.P.C অনুচ্ছেদ ৩৭৫) : কেউ অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে নিম্নলিখিত ছয় প্রকারের যে কোনো অবস্থায় সহবাস করলে তাকে ধর্ষণের আওতায় আনা হয়।

১। নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (শারীরিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে)।

২। নারীদের অসম্মতিতে (অচৈতন্যতার সুযোগ নিয়ে)।

৩। সম্মতিতে কিন্তু মৃত্যু বা আঘাতের ভয় দেখিয়ে ।

৪। ভ্রমাবশত অন্য পুরুষকে নিজের স্বামী ভেবে সহবাসের সম্মতি দিলে এবং সহবাসকারীর তা জানা থাকলে।

৫। নারীদের অসম্মতিতে ; যখন তারা এরূপ সম্মতি দেয় যার কারণ বুঝতে তারা নিজেরা অসমর্থ্য। কারণগুলি হল-

ক। মানসিক ভারসাম্যহীন।

খ। নেশাগ্রস্ত অবস্থায়।

গ। চেতনানাশকারী বা ক্ষতিকর কোন দ্রব্য ঐ স্ত্রী লোকটির উপর প্রয়োগ করে ।

৬। ষোলো বছরের কম বয়স্কা স্ত্রী লোকদের সম্মতিতে বা অসম্মতিতে।

শাস্তি **:** উপধারা ২ ব্যতিত শাস্তি অনধিক সাতবছর সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন বা ১০ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে।

বৈবাহিক ধর্ষণ (৩৭৬(A)) : বিচ্ছেদের রায় বা অন্য কারণে পৃথকভাবে থাকার সময় নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে বৈবাহিক ধর্ষণ গণ্য হবে।

শাস্তিঃ ২ বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

যদিও আমাদের দেশে বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসাবে দেখা হয় না এবং এই আইনটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে[৩]।

খ। অপহরণ ও বিভিন্ন উদ্দেশের জন্য পাচার করা (৩৬৩-৩৭৩) :

৩৬৩ ধারা **:** ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ধারাতে কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে ভারত থেকে অপহরণ করে অথবা আইনি অবিভাবকের কাছ থেকে অপহরণ করে তাহলে তার সাতবছর কারাদণ্ড হবে এবং আইনত অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য থাকবে।

৩৬৪ ধারা : কোনো ব্যক্তিকে যদি খুন করার জন্য অপহরণ করা হয় তাহলে ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ধারাতে দোষীরা শাস্তি পাবে। দোষী ব্যক্তির দশবছর জেল ও অর্থদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাবাস ও হতে পারে।

৩৬৫ ধারা : কোনো ব্যক্তিকে যদি গোপনভাবে আটকে রাখা হয় অথবা উদ্দেশ্যহীন ভাবে অপহরণ করে তাহলে ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ধারাতে সাতবছর কারাদণ্ড হবে ও অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য থাকবে।

৩৬৬ ধারা : ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ধারায় যদি কেউ কোনো স্ত্রীলোককে বলপূর্বক বিয়ের জন্য বা অবৈধ সংসর্গে রত করার জন্য অপহরণ করে তাহলে এই ধারাতে দশবছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড হবে।

৩৬৭ ধারা : ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ধারা অনুযায়ী কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত, দাসত্ব ইত্যাদির জন্য অথবা গুরুতর বিপদ হানার জন্য অপহরণ করে তাহলে দশবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা দিতে হবে।

৩৬৮ ধারা : কোনো ব্যক্তিকে বন্দি করা, অপহরণকৃত ব্যক্তিকে ভুল ভাবে গোপন রাখা হয় তাহলেও দশবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা দিতে হবে।

৩৬৯ ধারা : দশবছরের কম কোনো বাচ্ছাকে চুরি করার উদ্দেশ্যে এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে স্তাবর সম্পত্তির মালিকানাধিন সম্পত্তি থেকে অপহরন করে তাহলে দণ্ডবিধি অনুযায়ী সাতবছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা দিতে হবে।

৩৭০ ধারা : শোষণের উদ্দেশ্যে- ১. নিয়োগ, ২. স্থানান্তর(বন্দর), ৩. হস্তান্তর অথবা ৪. এক ব্যক্তি থেকে অন্যকে হুমকি দ্বারা, জোর পূর্বক বা অন্য কোন ভাবে যেমন জালিয়াতির দ্বারা, ক্ষমতার অপব্যাবহার করে অপহরন করলে- অপরাধটি ছোটখাটো পাচারের সাথে জড়িত থাকলে দশবছর বা যাবজ্জীবন ও অর্থদণ্ড হতে পারে। কোনো নাবিক পাচারের সাথে যুক্ত থাকলে চোদ্দবছর বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা দুটোই হবে। কোনো ব্যক্তি যদি একাধিক ছোটখাটো পাচারের সাথে জড়িত থাকে তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা

দুটোই হবে। যখন কোনো সরকারি কর্মচারী বা পুলিশ কর্মকর্তা পাচারের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা দুটোই হবে।

৩৭১ ধারা **:** যে ব্যক্তি ক্রীতদাস ক্রয়বিক্রয় করে সে ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ধারা অনুযায়ী দশবছর বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা দুটোই ভোগ করবে।

৩৭২ ধারা **:** পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিকে অপহরণ করলে এই ধারা অনুসারে দশবছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা দুটোই হবে।

৩৭৩ ধারা **:** আঠারো বছরের কম ব্যক্তিকে বেআইনি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য অপহরণ করলে দশ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা দুটোই হবে[৪]।

গ। শ্লীলতাহানি (অনুচ্ছেদ ৩৫৪) : ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ধারাতে শ্লীলতাহানির সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে হতে পারে, এরকম বল প্রয়োগ করলে বা আক্রমন করলে এই ধারায় অপরাধী হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ৩৫৪ ধারার সম্প্রসারন ঘটে ২০১৩ সালে। যা নিচে উল্লেখ করা হল-

৩৫৪(A) ধারা **:** যদি উল্লিখিত কাজগুলি ঘটে তাহলে এই ধারায় দণ্ডিত হবে। ১.শারীরিক স্পর্শ যা অপ্রত্যাশিত এবং যৌন আবেদনমূলক, ২. যৌন সম্ভোগের দাবী বা অনুরোধ করা, ৩. যৌন বিষয়ক রঙিন বা রোমাঞ্চকর মন্তব্য প্রকাশ, ৪. জোরপূর্বক পর্ণগ্রাফি প্রদর্শন করা, ৬. অন্যান্য অপ্রত্যাশিত শারীরিক/মৌখিক/সামাজিক ভাবে যৌন আবেগ প্রকাশ করা

৩৫৪(b) ধারা **:** যদি কেউ জোর করে জনসমক্ষে কোন স্ত্রী লোকের পোশাক উন্মোচন করার বা নগ্ন করার উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করে/সহায়তা করে তবে এই ধারায় দণ্ডিত হবে।

৩৫৪(c) ধারা **:** যদি কেউ কোন স্ত্রীলোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অসতর্কতার সুযোগে ক্যামেরায় ছবি তোলে তাহলে এই ধারায় দণ্ড পাবে।

৩৫৪(d) ধারা **:** যদি কেউ কোনো স্ত্রীলোককে অনুসরণ করে, অবাঞ্ছিত যোগাযোগ করে, কারো কাছে লালিত পালিত হওয়া স্ত্রীলোকের সাথে যোগাযোগ করায় উদ্যত হয় এবং তা পরিস্কারভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রমানিত হয় অথবা কোনো ব্যক্তিকে নেট, মেল বা কোন বৈদ্যুতিক যোগাযোগের মাধ্যমে উত্যক্ত/দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, হিংসাজনিত ভয়ের উদ্বেগ সৃষ্টি করলে বা সম্পর্কের মধ্যে যন্ত্রণার উদ্বেগ সৃষ্টি করলে বা অনধিক চর্চা সৃষ্টি করলে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধারায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে, এক্ষেত্রে দুইবছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডই হতে পারে।

ঘ। যৌনহয়রানি ও ইভটিজিং (অনুচ্ছেদ নং ৫০৯ও২৯৪) :

৫০৯ ধারা **:** কোনো মহিলাকে অপমানের উদ্দেশ্যে শব্দ, অঙ্গভঙ্গি করা, কোনো বস্তু প্রদর্শন করা, শোনানো ও দেখানো যাতে তার অপমান হয় তাহলে এই ধারায় দণ্ডিত হবে।

শাস্তি **:** দণ্ডিত ব্যক্তির একবছরের জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হবে।

২৯৪ ধারা **:** জনসমক্ষে বাজে অঙ্গভঙ্গি করা, অশালীন গান, কাজ ও শব্দের মাধ্যমে মহিলাদের উত্যক্ত করলে এই ধারা অনুযায়ী দণ্ড পাবে।

শাস্তি **:** ৩ মাস জেল, জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে[৫]।

১.8। স্বাধীনতার পরে নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রচুর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত সরকার এমন অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা আইনের মধ্যে থাকা অসাম্যকে দূর করে দিয়েছে যে আইন দ্বারা মহিলাদের অবস্থানকে নিচু করা হত। মহিলাদের রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন আইন আলোচনা করা হল-

১। গার্হস্থ্য হিংসা আইন (২০০5) : এই আইনের তিন নম্বর ধারায় গার্হস্থ্য বা ঘরোয়া হিংসা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ক. যদি কেউ শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, অর্থনৈতিক ও যৌন নির্যাতন ঘটায় এবং স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও জীবন বিপন্ন করে তোলে। খ.

ক্ষতিগ্রস্ত করে, আহত করে বা কোনো যৌতুক বা অন্য কোনো সম্পদ বা মূল্যবান নিরাপত্তার জন্য বা বেআইনি কোনো চাহিদা পূরণের জন্য তার বা তার সংক্রান্ত অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে নিগৃহীত করে। গ. কোনো ব্যক্তি বা তাঁর সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তির উপর পূর্ব আলোচিত অনুচ্ছেদ ক বা খ বিষয়ক হুমকি প্রদান করে। ঘ. কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি ঘটালে সেই ঘটনাকে গার্হস্থ্য বা ঘরোয়া সহিংসতার আওতায় আনা হয়।

২০০৫ পর্যন্ত গার্হস্থ্য হিংসার শিকারে উপলব্ধ প্রতিকারগুলি ছিল সীমিত। সেক্ষেত্রে মহিলাদের তালাকের আদেশের জন্য সিভিল কোর্ট অবধি যেতে হয়েছিল অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮(এ) অনুযায়ী শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসেবে ফৌজদারি আদালতে প্রসিকিউসন শুরু করতে হয়েছিল। দুটি ক্ষেত্রেই নির্যাতিতার আপদকালীন ত্রান পাওয়া যেত না। এছাড়া বিবাহের বাইরে অন্য কোনো সম্পর্ককে চিহ্নিত করা হত না। এই সমস্ত কারণ জেনেই পার্লামেন্ট এই আইনটি প্রণীত করেন।

IPC তে গার্হস্থ্য হিংসার উদাহরণ ৪৯৮(এ) : স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় স্বজন একজন বধূর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করলে এই ধারায় তাকে বা তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে নিষ্ঠুর আচরণ বলতে শুধুমাত্র শারীরিক নয়, মৌখিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের আচরণকেই বোঝায়। এর জন্য দোষী ব্যক্তির তিনবছর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড হবে এবং অর্থদণ্ড দিতেও হবে। ১৯৮৩ তে পণ জনিত অপরাধগুলি আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এই ধারার মাধ্যমে ভারতীয় দণ্ডবিধি সংশোধিত হল এবং বধূ নির্যাতনকে যামিন অযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হোল[৬]।

২। যৌতুক নিরোধক আইন (১৯৬১) : এই আইনের দ্বারা পণ মানে হল- যে কোনো সম্পদ অথবা মূল্যবান জিনিস দেওয়া বা দেওয়ার অঙ্গীকার করা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে।

ক। বিয়েতে একপক্ষ কর্তৃক অপরপক্ষকে দেওয়া।

খ। বিয়ের আগে অথবা পরে একপক্ষ কর্তৃক অপরপক্ষকে কোনো কিছু প্রদান।

উদ্দেশ্য: ভারতে নারীবাদী আন্দোলন স্বাধীনতার আগে থেকেই শুরু হয়ে অনেকটা লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে থেকেই নারীবাদীরা আবার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সোচ্চার হয় তার মধ্যে একটি দাবী হল পণ প্রথার বিলোপ ও তাকে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা। পরবর্তীতে সোনি দেবরাজ ভাই বাবেরা ভাই বনাম গুজরাট রাজ্য কেসটি পর্যবেক্ষণ করে সুপ্রিম কোর্ট দেখান যে পণ আমাদের সমাজের গভীরে গেঁথে আছে, নারীমুক্তি আন্দোলনের পরও তার প্রচলন রয়েছে। শুধু মাত্র আইন দ্বারা সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয় তাও আইনি নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তি হিসেবে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই আইনটি প্রবর্তন হয়।

পণ সম্বন্ধিত ধারা (৩০৪, বি) : পণ ঘটিত বধূ মৃত্যু আইন। একজন গৃহবধূকে তার বিয়ের সাত বছরের মধ্যে আগুনে পুড়ে বা তার কোনো দৈহিক ক্ষতি বা অস্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু এবং যদি দেখা যায় মৃত্যু ঘটার আগে ঐ বধূকে তার স্বামী বা স্বামীর কোনো আত্মীয় দ্বারা পণ দাবীর জন্য নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচারের শিকার হতে হয়ে ছিল, তখনই এই ধরণের মৃত্যুকে পণ ঘটিত বধূ মৃত্যু বলা হয়। স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় কেউ এই ধরণের মৃত্যু ঘটালে সাতবছরের মেয়াদের কম নয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

আত্মহত্যায় প্ররোচনা সম্বন্ধিত ধারা (৩০৬) : এক্ষেত্রে দশবছরের কারাদণ্ড তদুপরি অর্থদণ্ড ও হতে পারে।

গর্ভপাত সম্বন্ধিত ধারা (৩১২) : কেউ ইচ্ছাপূর্বক কোনো গর্ভিণী স্ত্রীলোকের (সরল বিশ্বাসে ঐ স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষার জন্য করা না হলে) গর্ভপাত করলে তার তিনবছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড হতে পারে।

৩১৩ ধারা : কেউ কোনো গর্ভিণী স্ত্রীলোকের বিনা অনুমতিতে গর্ভপাত করলে তার দশবছরের কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদুপরি অর্থদণ্ড ও হবে।

৩১৪ ধারা : গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভপাতের সময় তার প্রাণনাশ ঘটায় তবে তার দশবছরের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড হবে।

৩১৬ ধারা : গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভস্থ শিশুর জীবন নষ্ট করলে সেই ব্যক্তির অপরাধ নরহত্যার হবে এবং তাঁর দশবছরের কারাদণ্ড এবং তদুপরি অর্থদণ্ড ও হবে।

আঘাত সম্বন্ধিত ধারা (৩১৯) : কেউ শারীরিক বেদনা, পীড়া, অসুস্থতা ঘটালে আঘাত করা বলে[৭]।

৩। অসৎভাবে পাচার (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৫৬ : ১৯৫০ সালে ৯ই মে নিউইয়র্ক শহরে সাক্ষরিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে আইনটি অনুসৃত হয় অসৎভাবে পাচার বন্ধ করার জন্য। ভারত স্বাধীনতার সপ্তম বছরে সংসদ কর্তৃক প্রণয়ন হয়। পাচারের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বেশ্যাবৃত্তির নাম। এই আইনে ব্রথেল যার মধ্যে কোনো বাড়ী, নিজস্ব কক্ষ, স্থান যৌন নির্যাতনের কাজে ব্যবহার হয় অথবা সম্মতভাবেই যৌনকর্ম চালানো হয়, তাহলে দোষী সাব্যস্ত হবে। যদি কোনো সাবালক ব্যক্তি কোনো পতিতার উপার্জনে জীবন নির্বাহ করে তাহলে সে দুইবছর শাস্তি ও একহাজার টাকা অথবা উভয়ই পাবে। আর যদি কোনো শিশু (১৬বছরের কম) দ্বারা যৌনকর্ম করায় তাহলে দোষীদের শাস্তি হবে সর্বোচ্চ সাত থেকে দশ বছর জেল। কাউকে পতিতাবৃত্তিতে উৎসাহ দিলে বা তার উপার্জন আত্মসাৎ করলে সাত বছর জেল ও দুই হাজার টাকা জরিমানা হবে। নিজে থেকে পতিতাবৃত্তিতে আসলে তিন থেকে সর্বোচ্চ সাত বছর জেল হবে। ২০০৬ সালে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক একটি সংশোধিত বিল পেশ করেন যা এখনও পাস হয়নি। এটি শিশুদের ক্ষেত্রে লাভজনক না হলেও যৌনকর্মীদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল দেবে[৮]।

৪। মহিলাদের অশালীন উপস্থাপনা প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৬ : এই আইনটি মহিলাদের অশালীন প্রদর্শন সংক্রান্ত ভারতীয় সংবিধানের ২৯২ এবং ২৯৪ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হয়েছে। এতদ ব্যতিত বিভিন্ন প্রকাশনা বিশেষত বিজ্ঞাপনে প্রভৃতিতে মহিলাদের সম্মানহীনাকর এবং অবমাননাকর ভাবে উপস্থিত করার রীতি চলেছে। যদিও এই ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নেই তা সত্ত্বেও এগুলি মানুষের নৈতিক

চরিত্র ও মর্যাদা বোধকে নিম্নতর করে দেয়। সেই কারণে একটি আইন বিশেষ করে মহিলাদের অশালীন প্রদর্শন বন্ধ করার জন্য প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে বলা হয়েছে, যে কোনো ব্যক্তি কোনো ভাবে মহিলাদের অশালীন ভাবে প্রদর্শন করার জন্য কোনো বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা বা কোনো প্রদর্শন আয়োজন বা অংশ গ্রহনের ব্যবস্থা করতে পারবে না। কোনো ব্যক্তি মহিলাদের অশালীন ভাবে প্রদর্শিত কোনো বই, প্রকাশনা, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি ডাক দ্বারা প্রেরন করতে পারবে না, বিক্রি করতে পারবে না, বিলি করতেও পারবে না।

এই আইনটিতে রাজ্য সরকারের কোনো সরকারি অফিসারকে তার কাজের এলাকার মধ্যে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটানোর উপযুক্ত সময় সেই জায়গায় গিয়ে সহায়তার প্রয়োজন থাকলে তা নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রবেশ ও সন্ধানকার্জ চালাতে পারে। এই উদ্দেশ্য যে যেখানে এই আইনের নির্দিষ্ট কোন অপরাধ ঘটেছে কিনা এবং প্রকৃত কোন অপরাধ ঘটে থাকলে সেখান থেকে বিজ্ঞাপিত চিত্র, লেখা বই, স্লাইড, কাগজ ছবি, অঙ্কিত ছবি অথবা অন্যান্য কোনো চিত্র যা এই আইনের উদ্দেশ্যের বিরোধী তাহলে সেগুলিকে আটক বা বাজেয়াপ্ত করা। সরকার নির্দিষ্ট আধিকারিক কোনো নথি, খাতা বা রেকর্ড সরেজমিনে দেখে যদি মনে করেন যে সেটা এই আইনের আওতায় অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তাহলে তিনি উপযুক্ত প্রমাণসহ সেগুলি আটক করতে পারে। এই সন্ধান এবং আটক করার ক্ষেত্রে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর ১৯৭৩ প্রযোজ্য হবে। উক্ত আইনে ৯৪ ধারা অনুযায়ী ওয়ারেন্ট জারি করতে হবে।

শাস্তি : কোনো ব্যক্তি যিনি এই আইনের ৩ ও ৪ নং ধারা অনুযায়ী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তাকে অপরাধের জন্য সশ্রম ও বিনাশ্রম কারাদণ্ড সর্বোচ্চ দুইবছরের জন্য এবং দুই হাজার টাকা জরিমানা হবে, উভয়ও হতে পারে। দ্বিতীয় বা তার বেশি অপরাধের জন্য ন্যূনতম ৬ মাস থেকে সর্বোচ্চ পাঁচবছরের জন্য এবং দশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা অবধি জরিমানা হবে[৯]।

৫। সতী (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৭ : সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশ ভারতে ১৮২৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এর সহায়তায় সতীদাহ রদ আইন পাস করেছিল। তৎকালীন বহু বিদ্দ্যজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও আইনটি প্রণয়ন হয়েছিল। কিন্তু আইনটিতে সরাসরি সতীদাহ রদের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছিল কেউ সতীদাহ হতে দেখলে আটকাবে। স্বাধীন ভারতে ১৯৮৭ সালে রাজস্থানের একটি গ্রামে ১৮ বছরের বিধবা রূপ কানওয়ারকে সতী করা হলে নারীবাদী সংগঠনগুলির নেতৃত্বে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয়। আধুনিক একটি দেশে এই ধরনের ঘটনা মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। শেষপর্যন্ত সরকার সতী (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৭ আইন পাস করেন। যার দ্বারা ভারতে সতী প্রথা একেবারেই নিষিদ্ধ করা হল[১০]।

৬। মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, ১৯৬১ : ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার উল্লিখিত সামাজিক ন্যায় বিচার কর্মরত মহিলারাও পেতে পারে। সেই দিক থেকে লক্ষ রেখে সন্তান জন্মাবার আগে ও পরে অর্থাৎ মাতৃত্বকালীন কিছু সুবিধা এই আইনে দেওয়া হয়েছে। এই সুবিধা সব সরকারি অফিস সমেত দশ বা তার বেশী জন কাজ করে এমন যে কোনো প্রতিষ্ঠান, কারখানা, খনি বা ওই ধরনের যে কোনো সংস্থায় কর্মরত মহিলারা পেতে পারেন। মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটির অধিকার প্রত্যেক কর্মরত মহিলা ৫ ধারা অনুযায়ী পাবে। এই ধারা অনুযায়ী সর্বমোট ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটি কর্মরত গর্ভবতী মহিলারা পেতে পারেন। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বি. সাহ বনাম শ্রম আদালত (কোয়েম্বাটুর) মামলায় আরও বলেছেন যে, এই ১২ সপ্তাহের সবেতন ছুটি বলতে রবিবার বা মজুরি বিহীন ছুটির দিনের বেতন সব কিছু নিয়ে ১০০ শতাংশ যা প্রাপ্য তাই দিতে হবে। এই আইনের ৫(ক)ধারায় বলা হয়েছে কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন ১৯৪৮ এর সুবিধা নিয়ে থাকলেও মাতৃত্বকালীন সুবিধা অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হবে[১১]।

৭। সমহারে বেতন আইন, ১৯৭৬ : আন্তর্জাতিক নারীদশকে এই আইনটি প্রবর্তিত হয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারীদের সমমজুরি চালু করতে এই আইন তৈরি হয়। পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের একই রকম কাজের জন্য একই হারে বেতন প্রদান ও লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিহত

করতে এই আইনটি প্রবর্তিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের ৩৯ এর ক ও খ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমকাজে সমবেতন নীতি কার্যকর করার লক্ষে সংসদ এটি তৈরি করে। সুপ্রিমকোর্ট রনবীর সিং বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় সংবিধানের ১৪-১৬ এবং ৩৯ ঘ অনুচ্ছেদের সঠিক ব্যাখ্যা করে, সমকাজে সমবেতনের নীতি সংবিধান সম্মত তা তুলে ধরেন[১২]।

৮। মেডিক্যাল টার্মিনেসন অফ প্রেগন্যান্সি আইন ১৯৭১ ও প্রি-কন্সেপ্সন, প্রি-নাটাল, ডায়াগনস্টিক টেকনিক ১৯৯৪ : ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী গর্ভপাত করানো বা ভ্রূণ হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ। ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬ ধারাগুলি এই সংক্রান্ত। মেডিক্যাল টার্মিনেসন অফ প্রেগন্যান্সি আইন ১৯৭১ সালে পাস হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্ষণের ফলে যে সব অবাঞ্ছিত গর্ভধারন হয় যা গর্ভবতীর মানসিক বা দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক; বা কোনো বিবাহিত নারীর গর্ভধারন যদি অবাঞ্ছিত হয় বা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকারক তাহলে কোনো নিবন্ধিকৃত ডাক্তার গর্ভপাত ঘটাতে পারবে। কিন্তু আলট্রাসাউন্ড পদ্ধতির ব্যবহার করে ভ্রূণ নির্বাচন করে কন্যা ভ্রূণ বিনষ্ট করা হতে লাগল। বিজ্ঞানের এই অপব্যবহার রোধ করতে আইন এল, দি প্রি-নাটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিক (রেগুলেসন এন্ড প্রিভেনশন অফ মিসইউজ) আইন ১৯৯৪, উদ্দেশ্য ছিল কন্যা ভ্রূণহত্যা রোধ করা, লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পর্কে সমস্ত বিজ্ঞাপন বেআইনি ঘোষিত করা ও ২২ ধারা অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রি-নাটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিক ব্যবহার করা যাবে তা চিহ্নিত করা ও কেবলমাত্র নথিভুক্ত সংস্থাগুলিকে অনুমতি দেওয়া এবং অনথিভুক্ত সংস্থাগুলি ও আইনভঙ্গকারী ডাক্তার, পরিবারের লোকেরাও ২৩ ধারা অনুসারে শাস্তি পাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু রাজ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অদ্ভুতভাবে কমতে লাগলো। কারণ ততদিনে গর্ভের বাইরেও নিষিক্তকরন সম্ভব হচ্ছে ফলে নির্বাচিত পুরুষ ভ্রূণকেই গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে।

তাই ১৯৯৪ তে প্রি-নাটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিক ১৯৯৪ বিলটি সংশোধন করে প্রি-কন্সেপ্সন কথাটি যুক্ত করা হল। প্রি-কন্সেপ্সন প্রি-নাটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিক আইন

অনুযায়ী দোষী ব্যক্তির পাঁচবছর জেল ও পঞ্চাশ হাজার থাকা এবং পরিবারের লোক দোষী হলে পাঁচবছর জেল ও এক লাখ টাকা জরিমানা হবে[১৩]।

৯। কর্মক্ষেত্রে নারীর যৌনহয়রানি (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধ ও প্রতিবিধান) আইন, ২০১৩ : রাজস্থান সরকারের কর্মচারী ভানওয়ারী দেবী গ্রামে বাল্যবিবাহ আটকাতে গেলে গ্রামেরই উচ্চবর্ণের পুরুষদের দ্বারা ১৯৯০ সালে ধর্ষিত হন। কিন্তু তিনি বিচার পাননি তখনই বিশাকা নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সুপ্রিমকোর্টে আপিল করেন। এর ভিত্তিতেই সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানের ১৪,১৫,১৯(১.g) এবং ২১ ধারায় লিঙ্গ সাম্য, কর্মের অধিকার, মনুষ্য মর্যাদা তুলে ধরে এই আইনটি প্রণয়ন করেন। কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের শিকার মহিলারা এই আইনের দ্বারা ন্যায়বিচার পাবে। FYCCI-EY এর ২০১৫ রিপোর্ট অনুযায়ী ৩৬ শতাংশ ভারতীয় কোম্পাণী ও ২৫ শতাংশ MNC এই আইন অনুবর্তন করেনি[১৪]।

১০। বিভিন্ন ধর্মের পারিবারিক আইন :

ক। বিবাহ আইন : আমাদের দেশে খ্রিষ্টান (১৮৭২) এবং পার্শিদের (১৯৩৬) লিখিত আইন ছিল। স্বাধীনতার পর হিন্দুদের জন্য আইন পাশ হল (১৯৫৬)। খ্রিষ্টান ও পার্শিদের মতো হিন্দু বিবাহ আইনেও পাত্রের বয়স ২১ ও পাত্রীর ১৮ ধরা হয়েছে। স্বামী বা স্ত্রী বর্তমান থাকাকালীন দ্বিতীয় বিয়ে অবৈধ। পাত্রপাত্রী মানসিক ভারসাম্যহীন না হয়, নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে না হয়, অনুষ্ঠান হবে নিজস্ব পারিবারিক রীতি মেনে অন্যথায় তা আইনসিদ্ধ হবে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের লিখিত আইন নেই, তাই তাদের মতে রজঃশ্বলা হওয়াই বিয়ের জন্য বৈধ বয়স। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ঠিক নয় কারণ শিশুবিবাহ নিরোধক আইন ১৯২৯ সব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উল্লেখ্য ১৯২৯ এর আইনটি আজও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বলবত আছে। অতএব উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দেওয়া মোটেই ইসলাম বিরোধী নয়। আগে খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের বিবাহ নথিভুক্তকরন কাজী ও গির্জায় হলেও এখন সরকার বিবাহ নিবন্ধনকারিক নিয়োগ করেন।

খ। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন : সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদ আইন আছে। ডিশলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ আক্ট ১৯৩৯ দ্বারা কেবল মাত্র মুসলিম মেয়েরা আদালতে যেতে পারবে বিচ্ছেদ চাওয়ার জন্য। ২০১৮ তে সুপ্রিমকোর্ট ইসলাম বিরোধী তিন তালাক নিষিদ্ধ করেছে। এছাড়াও মুবারাত বা Mutual Divorse এর সুবিধাও আছে।

আন্তর্জাতিক নারীদশকে হিন্দু বিবাহ আইনেও Mutual Divorse চালু হয়েছে। এছাড়াও পার্শিবিবাহ আইনেও Mutual Divorse আছে। ১৮৭২ সালের খ্রিষ্টান আইনে নিষ্ঠুরতা ও ব্যভিচারের কারনে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ২০০1 সালে নারীর ক্ষমতায়নবর্ষে আইনি পরিবর্তন হয়, ফলে অনেক সহজে খ্রিষ্টানরা বিচ্ছেদ নিতে পারছে।

গ। ভরণপোষণ আইন : হিন্দু দত্তক ও ভরণপোষণ আইন অনুযায়ী স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্বামীর মৃত্যুর পর তার বাবার।

ফৌজদারি বিধির ১২৫ ধারায় যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ ভরণপোষণের দাবি করতে পারবে।

তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের সুরক্ষার জন্য ১৯৮৬ তে ভরণপোষণ আইন পাশ হয়। সুপ্রিম কোর্টের শাহবানু মামলার আদেশকে নাকচ করতে এই আইন। এতে বলা আছে তিন ইদ্দতকাল পর্যন্ত স্বামী তারপর বাবা, ভাই আর কেউ না পারলে ওয়াকফ বোর্ড দায়িত্ব নেবে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ড খোরপোষ দেয়না। উল্লেখ যে ১৯৯৫ সালের কেন্দ্রীয় ওয়াকফ আইনেই ভরণপোষণের কোনো ব্যবস্থা নেই।

ঘ। অভিভাবকত্ব আইন : ১৮৬০ সালের গার্ডিয়ান এন্ড ওয়ার্ডস আইন অনুসারে এখনও অবিভাবক নিযুক্ত হয়। ব্যক্তিগত আইনে এ ব্যাপারে নির্দেশ থাকলেও আদালত তা সবসময় প্রয়োগ করে না। নাবালকের মঙ্গলই এখানে বিচার্য বিষয়। হিন্দু মাইনরিটিস এন্ড গার্ডিয়ানশিপ আইন অনুযায়ী কোনো নাবালক বা অবিবাহিত মেয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবিভাবক তার বাবা তারপর মা। এই আইনটি সংবিধানের পরিপন্থী কারণ শুধু মৃত্যু নয়

আরও অনেক সঙ্গত কারণে বাবার পক্ষে দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয়না। তাই আদালত রায় দেন বাবার অবর্তমানে মায়ের দায়িত্ব নিতে আইনি বাঁধা থাকতে পারে না। এই রায়দানের পরে মায়েদের অধিকার আরও দৃঢ় হয়েছে। এ বিষয়ে আরো উল্লেখ পাওয়া যায়, ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে ভারতীয় মুসলিমরাও দত্তক নিতে পারবেন ধর্ম এক্ষেত্রে বাধা হবে না। উল্লেখ্য যে মুসলিম আইনে কাউকে দত্তক নিলে অবিভাবক হওয়া যায়, পিতামাতা হওয়া যায় না। এই রায়দানের পর পালিত সন্তানরা দত্তক হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।

ঘ। উত্তরাধিকার আইন : ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে খ্রিষ্টান ও পার্শি সম্প্রদায়ের যারা উইল করেননি তাদের উত্তরাধিকার নিয়ম স্থির করা হয়েছে।খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের আইনে বিধবা পাবে ১/৩ অংশ এবং বাকি সন্তানরা পাবে। পার্শিদের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানেরা সমান পাবে।

১৯৫৬ তে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কোন হিন্দুর যদি ইচ্ছাপত্র না থাকে তাহলে সম্পত্তি মা, স্ত্রী ও সন্তানের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হবে। তবে ২০০৫ সালে আইনে কিছু সংশোধন করে বিধবারা পুনঃবিবাহ করলেও পূর্বের স্বামীর সম্পত্তি ভাগ পাবে। মুসলিমদের ক্ষেত্রে শরিয়াত অনুযায়ী স্ত্রী পাবে সম্পত্তির ১/৮ অংশ। ছেলে মেয়ের মধ্যে মেয়ের ভাগ সবসময় অর্ধেক হবে[১৫]।

আমাদের সমাজে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধান প্রণীত ও আইনি অধিকার রয়েছে। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নারী নির্যাতন সমানতালে চলছে। আইন আছে তেমন আইনের ফাঁকও আছে, যা ব্যবহার করে অপরাধীরা সুযোগ পেয়ে যায়। এর কুফল ভোগ করছে নারীরা।

তথ্যসূত্র :

১। https://www.mapsofIndia.com,retrived on 4 may, 2019

২। বাগচি, যশোধরা ও ভাদুড়ী, অনিন্দিতা, (সম্পাদিকা), *মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০১, পৃ.-২৪-২৭

৩। ব্যানার্জি, গার্গী (সম্পাদিকা), *মেয়েদের অধিকারঃ একটি আইন সহায়িকা,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র ও রোসা লুক্সেমবুর্গ স্টিফটুং, কলকাতা, ২০১১, পৃ.-৯-১১

৪। পূর্বোক্ত, পৃ-১৩-১৪

৫। *আইনে নারীর অধিকার, নারীদের সহায়ক অন্যান্য আইন,* উন্নয়ন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.-৫৮

৬। *আইনে নারীর অধিকার, পারিবারিক নির্যাতন ও আপনি,* উন্নয়ন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.-২৭-৩০

৭। ব্যানার্জি, গার্গী (সম্পাদিকা), *মেয়েদের অধিকারঃ একটি আইন সহায়িকা,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র ও রোসা লুক্সেমবুর্গ স্টিফটুং, কলকাতা, ২০১১, পৃ- ৩-৮

৮। https://evaw-global-database.unwomen.org>asia, retrived on 4may, 2019

৯।*আইনে নারীর অধিকার, নারীদের সহায়ক অন্যান্য আইন,* উন্নয়ন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.-৩২-৩৩

১০। https://www.ncbi.nlm.nin.gov>pubmet,retrived on 25 april, 2019

১১। *আইনে নারীর অধিকার, নারীদের সহায়ক অন্যান্য আইন,* উন্নয়ন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.-৩৯-৪১

১২। বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী, (সম্পাদিকা), *প্রসঙ্গ মানবী বিদ্যা,* উর্বী প্রকাশন, ২০০৮, কলকাতা, ২০০৮, পৃ.-২৮৮-২৮৯

১৩। ভট্টাচার্য, মালিনী, (সম্পাদিকা), *আইনি অধিকার জানুন-ছেলে কি মেয়ে ভ্রুনের লিঙ্গ নির্ণয় বিরোধী আইন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস, কলকাতা,২০০৪, পৃ.-১৭-১৪

১৪। https://www.en.m.wikipedia.org, retrived on 9 may,2019

১৫। বাগচি, যশোধরা ও ভাদুড়ী, অনিন্দিতা, (সম্পাদিকা), *মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০১, পৃ.-৩৮-৪৬

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা ফলাফল ও বাস্তবচিত্র

ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা : ‘ক্ষমতায়ন শব্দটি মানুষের স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনির্ধারণের ডিগ্রি বৃদ্ধি করার জন্য এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের একটি স্বতঃফুর্ত ও আত্মনির্ধারিত ভাবে তাদের স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম করার জন্য, নিজস্ব কর্তৃপক্ষের উপর দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থাকে বোঝায়।

শব্দটি আমেরিকান সম্প্রদায়ের মনোবিজ্ঞান থেকে উদ্ধত হয় এবং যার দ্বারা সামাজিক বিজ্ঞানি জুলিয়ান রাপাপোর্ত যুক্ত। যদিও ক্ষমতায়নের শেকড় পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়েছিল ইতিহাসেও এবং মার্কসিয় সামাজিক থিওরিতে জুড়ে যায়। এই সামাজিক চিন্তা ভাবনাগুলি নিও মার্ক্সবাদী থিওরি (ক্রিটিকাল থিওরি নামেও পরিচিত) এর মাধ্যমে উন্নত ও পরিমার্জন করা অব্যাহত রয়েছে’[১]। কেমব্রিজ শব্দকোষ অনুযায়ী ক্ষমতায়ন মানে হল, সেই প্রক্রিয়া স্বাধীনতা অর্জন করার এবং যা আমি চাই তা করার ক্ষমতা অথবা আমার সাথে যা হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা[২]।

ব্যাপক ব্যবহারে ফলে ক্ষমতায়ন শব্দটির অর্থ অনেকটাই ছড়িয়ে গিয়ে এর স্পষ্টতা হারিয়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়নের পরিসরে এটি একটি বহুল উচ্চারিত ফাঁপাবুলিতে পরিনত হয়েছে। একসময় ক্ষমতায়ন বলতে মূলত বোঝানো হত। তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন লড়াইকে, যে গুলোর লক্ষ ছিল অসম ক্ষমতা সম্পর্কের মুখোমুখি হওয়া ও সেগুলো পালটে দেওয়া। তবে এক পর্যায়ে শব্দটি বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও এনজিও থেকে শুরু করে বহু বানিজ্যিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংগঠনও শিথিল অর্থে ব্যাবহার করতে শুরু করে[৩]। এভাবে এটি সাধারণ প্রয়োগে বাড়তে থাকে উন্নয়নের পরিসরেও যেখানে নারীদের ভূমিকা ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিষয়টিও ক্রমশ মনোযোগের

কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এমন উপলব্ধি থেকেই জেন্ডার ও ক্ষমতায়নের সম্পর্কের প্রতি মনোযোগ বাড়তে থাকে।

অবশ্য সংশ্লিষ্ট অনেকে ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নের মতো মৌলিক পদগুলোকে স্পষ্টতর ভাবে সংজ্ঞায়িত ও ধারনায়িত করার প্রয়াস করেছেন। যেমন বাতলিওয়ালা ক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন বলতে বুঝিয়েছেন যথাক্রমে বস্তুগত সম্পদ, বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ ও মতাদর্শের উপর নিয়ন্ত্রন এবং একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্কসমূহকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় এবং ক্ষমতার উৎস সমূহের উপর অধিক নিয়ন্ত্রন স্থাপন করা হয়। এদিক থেকে গীতা সেন বাতলিওয়ালার সংজ্ঞায়নকে আরও স্পষ্ট করার প্রয়াস করতে গিয়ে ক্ষমতার দুটি কেন্দ্রিয় দিকের উপর জোর দেন, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রন (বস্তুগত, মানবিক, বুদ্ধিভিত্তিক, অর্থনৈতিক ও আত্মসত্তাগত) এবং নিয়ন্ত্রন মতাদর্শের উপর (বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি)। একই সাথে তিনি নিজেকে প্রকাশের সামর্থ্যকে ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। একইভাবে নাইলা কবিরও জোর দিয়েছেন নারীদের নিজেদের বোঝার প্রক্রিয়ার উপর অন্যদিকে আন্দ্রেয়া কর্নওয়াল ক্ষমতায়নের সম্পর্কগত দিকের উপর বেশী জোর দিয়ে বলেন, নারীবাদীরা দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তি দিয়েছেন যে ক্ষমতায়ন বলতে নারীদের প্রতি বা তাদের জন্য কোনো কিছু করা বোঝায় না। প্রত্যেক নারী যখন নিজের ভেতরের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অন্য নারীদের সাথে একজোট হয়ে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে শেখে, তখনই তারা স্বাধীনসত্তা হিসেবে চলার ক্ষমতা অর্জন করে। এভাবে যখন তারা অন্যায় ও অসমতার মোকাবিলা করার সমন্বিত প্রয়াসে শামিল হয়, তা হয়ে দাঁড়ায় ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষমতা।

যে কোনো সমাজের ক্ষমতায়িত নারী তার জেন্ডারকে প্রতিফলিত করে শুধুমাত্র সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নীতিতে। সাহিত্য দেখায় যে নারীরা আর্থ-সামাজিক ভাবে তখন থেকেই দমিত যখন থেকে পৃথিবীতে মনুষ্য সভ্যতা শুরু হয়েছে, সাধারণ ভাবে সব নারী বিশেষত মুসলিম নারী এটাই নারীবাদী পদ্ধতি বিশ্বাস করে।

নারীদের ক্ষমতায়ন মানে হল- চিন্তা করার ক্ষমতা, মুক্তভাবে কাজ করা,ব্যাবহার ও পচ্ছন্দ করা, নিজেকে সমাজের সদস্য হিসেবে সমান ভাবা। নারীর ক্ষমতায়নকে সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নিরিখে। বর্তমান গবেষণা পত্রে মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নমালা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই দিকগুলির উপর আলোকপাত করব।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : মুসলিম মহিলারা সাধারণত ধর্মীয় রক্ষনশীলতার কারণে গৃহ মধ্যেই তাদের জীবন কাটিয়ে দেয়। বাইরের জগতের সাথে তাদের যোগাযোগ খুব কম থাকে। ফলত রাজনীতি সম্বন্ধে তারা খুবই অজ্ঞ। মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং প্রশাসনের কাছে। মহাত্মা গান্ধীও বিশ্বাস করতেন সম্পূর্ণ এবং সমতা সম্পন্ন জাতি গঠন ও সমাজ স্থাপন তখনই সম্ভব যখন নারীরা পুরোপুরি ও সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে। যদিও নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে বিবেচনা করা হয়েছে ক্ষমতায়নের মুখ্য মাপ হিসেবে। এটা লক্ষ রাখা দরকার যে, মুসলিম নারীদের রাজনীতির সাথে যোগাযোগ থাকলেও গ্রামের নারীরা সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে আসেনি।

এই গবেষনায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গবেষণাকৃত গ্রাম্য এলাকার একশো শতাংশ নারীই রাজনীতিতে আগ্রহ রাখে না। তাদের কাছে রাজনীতির মানে হল ভোট প্রদান করে কর্তব্য পালন করা। এটাও তারা নিজেদের মতাদর্শ অনুযায়ী প্রদান করে না। এক্ষেত্রে তারা বিয়ের আগে পিতার এবং পরে স্বামীর মতাদর্শকে অনুসরন করে। সাম্প্রতিককালে তারা কয়েকটি রাজনৈতিক আলোচনাতে অংশগ্রহণ করলেও তা তাদের মননে কোনো প্রভাব ফেলেনি। প্রসাশন প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহল। যেমন- স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আশা কর্মী, ICDS ইত্যাদি। কিন্তু সে সম্পর্কে সচেতন না হওয়ার দরুন তার সুফল ভোগ করতে পারে না। এছাড়াও এদের মতে গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা রাজনীতিতে গিয়ে কি করবে? সেই সঙ্গে নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবের কথাও তারা তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও গবেষণাকৃত শহর এলাকায় নারীরা তুলনায় কিছুটা সচেতন। এলাকার ষোল শতাংশ নারীরা নিজস্ব মত অনুযায়ী ভোট দেন কিন্তু তা তাদের স্বামীদের না জানিয়েই দেয়। বাকি মহিলাদের অবস্থা উক্ত গ্রাম্য মহিলাদের মতো একই। তারাও স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আশা কর্মী, ICDS ইত্যাদির সম্পর্কে ধারণা রাখেন। যদিও তারা নিজেদের সঠিক ভাবে চালনা করার অভাবে এই প্রকল্পগুলি তেমন ভাবে সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

বর্তমানে উভয় জায়গার নারীরা শুধু এটুকু জানে যে এখন নিয়ম হয়ে গেছে নির্বাচনে মেয়েদের দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু কততম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মেয়েদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে বা কত শতাংশ সংরক্ষিত হয়েছে সে ব্যাপারে তাদের ধারনা নেই। তাছাড়া পণ, গার্হস্থ্য সহিংসতা এই আইনগুলোর কথা শুনলেও তেমনভাবে বিশদে জানেন না।

সামাজিক ক্ষমতায়ন : সাধারণত একটি দেশে গনতন্ত্রকে সুগম করার চাবিকাঠি হল মানুষের হাতে। কিন্তু মুসলিম মহিলারা বাড়ির মধ্যেই বদ্ধ থাকে। ফলত দেখা যায়, তারা মুক্ত ভাবে পারিবারিক ও সামাজিক কাজে যুক্ত হতে পারে না। এমতাবস্থায় গ্রাম বা শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ মহিলারা আজও তেমনভাবে পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নয়।

ক। পারিবারিক খরচাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত : গ্রামীণ এলাকার পারিবারিক খরচ ও সংসার চালানোর কাজে একক ভাবে নয় যৌথ ভাবে ৬৬ শতাংশ নারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর বাকি ৩৪ শতাংশ নারী এখনও এই প্রক্রিয়ায় আসতে পারেনি।

শহরের ৯০ শতাংশ নারী স্বামীর সাথে যৌথ ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ নারী এখনও না একক ভাবে আর না যৌথ কোনো ভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আসেনি। এক্ষেত্রে পরিবারে পুরুষ সদস্যের কথাই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ

তুলনামূলক বিচারে শহর এলাকার নারীরা গ্রামীণ এলাকার নারীদের থেকে অনেকটাই বেশী পরিমানে (২৪শতাংশ) সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

যদি শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে যাচ্ছে যে, গ্রামীণ এলাকার ২৭.২ শতাংশ শিক্ষিত নারী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হলেও আবার ১৬.৭ শতাংশ নারী শিক্ষিত হয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহনে অংশ নিতে পারেনি। অপর দিকে শহর এলাকার ৩২.৩ শতাংশ শিক্ষিত নারী পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেও ৫.৬ শতাংশ শিক্ষিত নারী দৈনন্দিন জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে এখনও সক্ষম হয়নি। আবার নিরক্ষরতার দিক থেকে দেখলে তথ্য বলছে যে, গবেষণাকৃত গ্রাম্য এলাকায় ২২.৮ শতাংশ নারী নিরক্ষর হয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শহরাঞ্চলে ১৪.৫ শতাংশ নিরক্ষর নারী এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে। কিন্তু শহর এলাকায় নিরক্ষর নারীর সংখ্যা গ্রাম্য এলাকার থেকে কম তাই তুলনামূলক বিচারে শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় দিক থেকেই শহর এলাকার নারীরা এগিয়ে আছে।

খ। সন্তানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন : বাচ্ছাদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু পুরুষরা অনেক এগিয়ে নারীদের থেকে উক্ত গ্রাম্য এলাকায়। প্রায় সব উত্তরদাতাই জানিয়েছেন যে শিশুদের বড় করে তোলার পিছনের যাবতীয় সিদ্ধান্ত তাদের বাবারাই নেয়। অর্থাৎ তাদের স্কুলে ভর্তি, তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়, তাদের মনোরঞ্জনের বিষয়টি সবকিছু। মহিলারা সন্তানের জন্ম দিলেও তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাদের নেই।

অপরদিকের তুলনায় শহুরে নারীরা এবিষয়ে একটু এগিয়ে। এখানেও পুরুষরা শিশুদের ব্যাপারে নিজস্ব সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেও মহিলাদের সঙ্গে আলোচনা করে, স্ত্রীর মতামত কে প্রাধান্য দেয়। তারা সন্তানকে বড় করে তোলা, তার বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো, স্বাস্থের উন্নতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে। সন্তানের জীবনের সাফল্যের জন্য স্বামী-স্ত্রী সমান ভাবে চিন্তা- ভাবনা করে। সে সম্বন্ধে তারা একটু হলেও সচেতন। অর্থ উপার্জন করার প্রসারতা ও গৃহস্তালিতে তা খরচের সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের দেশের ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে পুরুষরাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং এটা গ্রাম ও শহর উভয় জায়গার জন্যই প্রযোজ্য।

গ। যৌন সম্মতি : পারিবারিক গৃহস্তালির খরচ যৌথ ভাবে নিলেও গবেষণাকৃত গ্রাম হোক বা শহর উভয় জায়গায় উত্তরদাতাই বলেছেন যে, সহবাস করার জন্য বা না করার জন্য কোনো যৌনসম্মতি তাদের নেই। এ বিষয়ে পুরুষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে ধরা হয়, নারীর কোনো ভূমিকা এখানে নেই। লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, উক্ত দুটি জায়গায় কোনো মহিলাদের যৌনসম্মতি সম্পর্কে তেমন কোনো ধারনা নেই। এছাড়াও তাঁদের বৈবাহিক ধর্ষণ সম্পর্কে কোনো ধারনা নেই। এক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে দুটি জায়গার মহিলাদেরই একই অবস্থা লক্ষ করা যায়।

ঘ। পরিবার পরিকল্পনায় অংশগ্রহন : যৌনসম্মতি না থাকলেও পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই নারী যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। শহরাঞ্চলের ৯৮ শতাংশ নারী পুরুষের সাথে যৌথভাবে পরিবার পরিকল্পনায় অংশগ্রহন করছে। মাত্র ২ শতাংশ নারীর সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হয় না। অপরদিকে উক্ত গ্রাম্য এলাকায় ৭০ শতাংশ নারী যৌথভাবে পরিবার পরিকল্পনা করছেন এবং ৩০ শতাংশ নারী যৌথভাবে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনে অক্ষম। অর্থাৎ তুলনামূলক বিচারে গবেষণাকৃত শহর এলাকার নারীরা অনেক বেশি এ ব্যাপারে স্বাধীনতা ভোগ করে।

একই বিষয়ে যদি স্বাক্ষর ও নিরক্ষরের মাপ দেখি তাহলে দেখব গবেষণাকৃত গ্রাম্য এলাকায় ৩৮ শতাংশ নারী নিরক্ষর হলেও পরিবার পরিকল্পনায় অংশ নিতে পেরেছে। আবার ৮ শতাংশ নিরক্ষর নারী পরিবার পরিকল্পনায় অংশ নিতে পারেনি। অন্যদিকে, উক্ত শহর এলাকায় ৩২ শতাংশ নারী নিরক্ষর হলেও এই প্রক্রিয়ায় আসতে পেরেছে। যেখানে মাত্র ২ শতাংশ নারী আসতে পারেনি। অর্থাৎ মোট নিরক্ষরের সংখ্যার নিরিখে এখানেও শহরের মহিলারা গ্রামের মহিলাদের থেকে বেশি মাত্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অপরদিকে সাক্ষরতার বিচারে দেখা যাচ্ছে যে গবেষণাকৃত গ্রাম্য এলাকার মোট সাক্ষর নারীর ৩৪ শতাংশ সিদ্ধান্ত নিতে পারলেও বাকি ১৬ শতাংশ নিতে পারছে না। অন্যদিকে শহর

এলাকার সমস্ত সাক্ষর মহিলাই সিদ্ধান্ত গ্রহনে সক্ষম। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও শহুরে নারীরাই এগিয়ে আছে।

এখানে গ্রাম্য নারীদের পিছিয়ে থাকার একটা কারণ হল সচেতনতার অভাব। যদিও ইসলাম অনুযায়ী সন্তান হত্যা কড়াভাবে নিষিদ্ধ। কোরানে এ ব্যাপারে বিধিবদ্ধ ভাবে বিশ্লেষণও করা আছে। কিন্তু গ্রামটিতে যতনা ধর্মীয় বেড়াজালের জন্য নারীরা সচেতন হয়নি, তার থেকে বেশি উপযুক্ত শিক্ষার ও মাধ্যমের অভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছে। যদিও পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে খুব ধীরে হলেও। ওপর দিকে শহর এলাকার নারীরা শিক্ষিত এবং বৈদ্যুতিন গনমাধ্যম ব্যবহার করার ফলত তারা অনেক বেশী সচেতন হয়ে ওঠে। তারা বিশ্বায়ন শব্দটি সেইভাবে না বুঝলেও পরিবার পরিকল্পনার কারণ হিসেবে তারা জানিয়েছেন যে, এখন যা বাজারদর পড়েছে সেই অনুপাতে উপার্জন কম কিন্তু ব্যয় বেশি হচ্ছে। তাই সচ্ছল থাকতে ও সন্তানকে সঠিক ভাবে মানুষ করার জন্য তারা এই বিষয়ে একটু বেশি যত্নবান হয়।

ঙ। অবাধ গতিময়তার স্বাধীনতা : এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের সবাই বলেছেন যে, আগের থেকে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই বদলেছে। আগে উক্ত গ্রাম্য এলাকার মহিলারা শুধুমাত্র বাপের বাড়ি যাওয়ার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার অনুমতি পেত।বর্তমানে তারা অন্যান্য কাজের জন্য অল্প মাত্রায় হলেও বেরতে পারছে। যেমন-বাজার যাওয়া, পোশাক কেনাকাটা করা,ব্যাংক এ যাওয়া ইত্যাদি। যদিও এগুলো করার জন্য স্বামীদের মৌখিক অনুমতি নিতে হয় তাও কড়াকড়ি অনেক শিথিল হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে উক্ত গ্রামের বয়স্কা মহিলারা অর্থাৎ যাদের বয়স চল্লিশের বেশি তারা আবার কম বয়সিদের থেকে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে।

অপরদিকে শহর অঞ্চলের নারীরাও যত্রতত্র যাবার আগে গ্রাম্য নারীদের মতই স্বামীর মৌখিক অনুমতি নেয়। এছাড়া আমরা সবাই জানি যে গ্রামের থেকে শহরের নারীরা বরাবরই একটু বেশি স্বাধীন। শহরের মেয়েরা আগেও যেমন নিজের ইচ্ছায় ঘুরে বেড়াত

এখনও সেরকমই আছে বরং তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রেও শহর এলাকার নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহনে একটু বেশি সক্ষম।

চ। পচ্ছন্দসই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের ক্ষমতা : এ ক্ষেত্রে উক্ত দুটি জায়গায়ই কোনো কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা নেই। তারা শাড়ি, চুড়িদার ইত্যাদি পোশাক-অলংকার পরিধান করেন। তার জন্য স্বামীর তরফ থেকে কোনো বাধা পান না। আমরা জানি যে মুসলিম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পর্দা (বোরখা)। তাও উক্ত দুটি জায়গায় পর্দা নিয়ে খুব বাধা নিষেধ নেই।গবেষণাকৃত গ্রামে শুধু মাত্র বয়স্কা মহিলারাই বোরখা পরেন। বাকি বিবাহিত নারীরা শাড়ির উপর ওড়না জড়িয়ে নেন বাইরে কোথাও বেরোলে। বাড়িতে থাকলে অত কিছু করেননা শুধুমাত্র কোন পুরুষ মানুষ এলে মাথায় পর্দা করে নেন। শহরাঞ্চলে কেউ তেমন ভাবে বোরখা পরেন না। বাদবাকি সব কিছুই গ্রামের মহিলাদের মতো একই রয়েছে।

তবে তথাকথিত পশ্চিমা পোশাক বা যাকে আমরা বলি আধুনিক পোশাক তা তারা কেউই পরিধান করেন না। এ ব্যাপারে তাদের কেউ বারন ও করেনি আবার অনুমতি ও দেয়নি। তবে ছোট থেকেই যে ধরনের পরিবেশে তারা বেড়ে উঠেছে সেখানকার প্রভাবের ফলেই তারা এ ধরনের পোশাককে বর্জন করেছে। যে ধরনের পোশাক তারা পরেন তাতেই নিজের মতো স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে নিয়েছেন। শহর লাগোয়া অঞ্চলের ৫৮ শতাংশ নারীরা স্বামীর কাছ থেকে সহায়তা পায় কিন্তু ৪২ শতাংশ নারীরা সহায়তা বঞ্চিত। ওপর দিকে উক্ত গ্রাম্য এলাকাতে ২৮ শতাংশ নারী স্বামীর কাছ থেকে সহায়তা পেলেও ৭২ শতাংশ নারীরা এই বিষয়ে কোনো সহায়তা পান না। এর কারণ হিসেবে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে, তাদের স্বামীরা মনে করেন যে স্ত্রীদের সহায়তা করা মানে পৌরুষে আঘাত করা। তার পরেও যে পুরুষদের আচরনে পরিবর্তন আসছে, এমন তথ্যও তারা দিয়েছেন। কিন্তু শহর এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এক সাথে থাকার ফলে তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটেছে ফলত তারা নারীদের বিষয়ে উদার মনোভাব গ্রহন করেছে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। অবশ্য শহুরে ও গ্রাম্য উভয় মহিলাদের

কথার ভিত্তিতেই একটু হলেও ক্ষীণমাত্রার প্রবনতা দেখা গেছে। যাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে ইতিবাচক দিক বলে ধরা যেতে পারে। তা হল কিছু মাত্রায় হলেও ঘরের কাজে পুরুষরা অংশ গ্রহণ করছেন। উক্ত গ্রামের পুরুষরা যে সমস্ত কাজে নারীদের সহায়তা করে সেগুলি হল ফসল প্রক্রিয়াজাতকরন, হাঁস মুরগি ও গবাদি পশুকে খাবার দেওয়া, জ্বালানি কাঠ জোগাড় করা, জল ভরা ইত্যাদি। ওপরদিকে শহরের পুরুষরা জল ভরা, আনাজ কেটে দেওয়া, শুকনো জামাকাপড় তুলে আনা ও গুছিয়ে দেওয়া, কখনো রান্না ও করে দেয়। তবে এই সবটাই কিন্তু পরিস্থিতি নির্ভর, সাময়িক অর্থাৎ প্রতিদিন বা দীর্ঘদিন তারা করে না ও সব কিছুই তাদের মর্জিমাফিক ঘটে। যদিও পরম্পরাগত ভাবে ভারতীয় মহিলারা তাদের স্বামীকেই নিজেদের মননে তাদের জীবনের সব ক্ষেত্রে অবিভাবক মানেন তাও পরিবারে পুরুষের সমর্থন ও সহায়তা নারীর ক্ষমতায়নের মাত্রাকে দৃঢ় করে। এটাকে ধরে নেওয়া যায় যে পরিবারে পুরুষের সহায়তা করা হল একটি মুখ্য ধ্রুবক মহিলাদের ক্ষমতায়ন দৃঢ় করার জন্য।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : মুসলিম মহিলারা হল পশ্চিমবঙ্গে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী। মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে ভর্তি না হতে পারাটাই হল প্রথম বাধা। মুসলিম মহিলাদের ৬০ শতাংশ গৃহিণী এবং বাদবাকি মহিলারা অর্থনৈতিক অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত। কর্মনিযুক্ত সর্বমোট মহিলাদের মধ্যে বেশিরভাগই কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকে বাদবাকিরা বাসনধোয়া, ইটভাটার কাজে, প্লাস্টিক সংগ্রহ, টিন কুড়ানো, বিড়িশ্রমিক, দোলনা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু গৃহ কর্মের জন্য আজও আমাদের দেশে কোনো বেতনের ব্যবস্থা করা হয়নি, ফলত তারা আর্থিক ভাবে স্বামীর উপর নির্ভরশীল।

ভারতের মহিলাদের অবস্থা অর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সবক্ষেত্রেই খুবই খারাপ পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায়। মহিলারা একই কাজের জন্য তার সহকর্মীদের থেকে ৩/৪ অংশ কম মাইনে পান। মুসলিম মহিলাদের বহিঃরঙ্গন প্রকৃতি সাধারণত দমনমূলক ও রক্ষণশীল। মহিলারা সমস্ত কৃষিকাজের অর্ধেক শতাংশই করে থাকে, কিন্তু তাদের কাজের

কোন মূল্যই নেই। একজন মহিলা সাধারণত বাড়ির কাজে এবং বাড়ি সংলগ্ন বাইরের কাজে ১৫-১৬ ঘণ্টা কাজ করে কোন মূল্য ছাড়াই । ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী প্রত্যেক ১/৫ মহিলারা হল কৃষিশ্রমিক। ১/৭ মুসলিম মহিলারা হল কৃষক[৪]। বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, গবেষণাকৃত দুটি জায়গারই নারীরা আর্থিকভাবে প্রায় স্বাবলম্বী নয় বলেই ধরা যায়। তথ্য দেখাচ্ছে যে, উক্ত শহর এলাকায় মাত্র ১২% নারী নিজে উপার্জন করেন। বাকি ৮৮% নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে উক্ত গ্রাম্য এলাকায় ৯৪% নারী আর্থিকভাবে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল এবং ৬% নারীরা বিভিন্ন উপায়ে উপার্জন করেন। যেমন- কাঁথা সেলাই করে, বাসনধোয়ার কাজ করে ইত্যাদি। এখানে ও তুলনামূলক বিচারে উক্ত গ্রাম্য এলাকার থেকে শহুরে এলাকার নারীরা বেশি পরিমানে স্বাবলম্বী। এক্ষেত্রে আমরা বলব গ্রাম্য ও শহর দুটি এলাকার নারীরাই উপার্জনের ইচ্ছা রাখেন কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছে। তবে আশার কথা একটাই শহরে হোক বা গ্রামে যে সব মহিলারা নিজে উপার্জন করছে তারা নিজেদের উপার্জিত অর্থ নিজের ইচ্ছে মতো খরচ করতে পারে তার জন্য সবসময় পুরুষের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। কিন্তু যারা উপার্জনশীল নয় তাদের অবস্থা শোচনীয়। সংবিধান অনুযায়ী সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের কথা বলা হলেও গ্রাম ও শহর দুই জায়গাতেই একটা বড় সংখ্যার মুসলিম হয় উপার্জনহীন অথবা কম মাইনের কাজের সাথে যুক্ত। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের জন্য সাধারণ কর্ম নিযুক্তির হার (১১.২৯%) সেই নিরিখে মুসলিম মহিলাদের অংশ গ্রহণের হার খুবই কম(২.৯২%)। মুসলিমদের মধ্যে মাত্র তিন শতাংশ আই-এ-এস(IAS), ১.৮ শতাংশ আই-এফ-এস (IFS) এবং চার শতাংশ আই-পি-এস (IPS)। তাছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক চাকরীতে মুসলিম নারীরা থাকলেও তার ভাগ খুব কম। সাংবিধানিক ভাবে সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার থাকলেও ৬-১৪ বছর বয়সী ২৩ শতাংশ মুসলিম মেয়েরা হল স্কুলছুট[৫]।

স্বাধীনতার ৭২ বছর পরেও আমাদের দেশে গ্রাম ও শহরের মুসলিম মহিলারা খুব উল্লেখ যোগ্য ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আসতে পারেনি। কারণ তারা এখনও আর্থিক ভাবে দুর্বল এবং সামাজিক ভাবে পঙ্গু। শিক্ষার কমতি আছে আছে তাদের মধ্যে। কিছু উচ্চ

শিক্ষিত সচেতন মহিলা ছাড়া বেশিরভাগ নারীরাই তাদের অধিকার সম্বন্ধে জানে না যে তাদের মুক্ত হওয়ার অধিকার আছে, তারা মুক্ত হওয়ার জন্য আখাঙ্খা করে। দারিদ্র, ধর্মীয় গোঁড়ামি ,বিশ্বাস মহিলাদের এই খারাপ অবস্থানের জন্য দায়ী। মহিলারা তাদের পরিবারের ভালোর জন্য সচেতন কিন্তু তারা তাদের স্বামীর উপর নির্ভরশীল কারন তারা স্বাবলম্বী নয় আর্থিক ভাবে। বেশিরভাগ উত্তরদাতা সহমত জানিয়েছেন সমাজে অবস্থিত সমান অধিকারের কথা নিয়ে, কিন্তু তারা তা উপভোগ করতে পারেন না। যেমন ইচ্ছা অনুযায়ী ভোটদান, দৈনন্দিন খরচ খরচা করতে এবং শিশুর পরিচর্যার বিষয়গুলি।

বাল্য বিবাহ : সারা ভারতের মতো পশ্চিম বঙ্গেও বাল্য বিবাহের হার খুব বেশি। কিন্তু আমার গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য দেখাচ্ছে, যে গবেষণা কৃত দুটি জায়গায় বাল্য বিবাহের হার খুব কম। অতীতে বাল্য বিবাহ হলেও বর্তমানে একেবারেই হয় না। গবেষণাকৃত গ্রামের মোট উত্তর দাতাদের মধ্যে ২৬ শতাংশ মহিলা বাল্য বিবাহের শিকার। যদিও তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ষাট এর ঘরে। অর্থাৎ তৎকালীন যুগের বেশিরভাগ নারীদের মতই এদেরও বাল্য বিবাহ হয়েছিল সম্মতি ছাড়াই। অপরদিকে উক্ত শহর লাগোয়া শহরে ১০ শতাংশ মহিলার বিয়ে কম বয়সে হয়েছিল। গ্রামের মতো এই সব মহিলাদের ও প্রত্যেকেরই বয়স ষাট এর ঘরে। ফলত এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে এরা প্রত্যেকেই একটু আমাদের কথায় পুরানো যুগের মানুষ এবং ওই সময়ে এটা প্রায় সব মেয়ের সাথেই ঘটেছে। কিন্তু গবেষণায় যে বয়সক্রম ধরা হয়েছিল সেই অনুযায়ী উক্ত গ্রামে ৭৪ শতাংশ নারীই পনেরো থেকে চল্লিশের বয়সের মধ্যে এবং তারা বাল্য বিবাহ মুক্ত ও তাদের সবারই বিয়ে আঠেরো বছর বয়সের পরই হয়েছে। অপর দিকে উক্ত শহুরে এলাকাতেও পনেরো থেকে চল্লিশের বয়সের মধ্যে ৯০ শতাংশ নারীর বিয়ে আঠেরো বছর বয়স পেরিয়ে যাবার পর হয়েছে। এর পিছনে কারণ হিসেবে শিক্ষার প্রভাব যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকেও বেশি প্রভাব ফেলেছে প্রশাসন দ্বারা আইনের প্রচার।যার মাধ্যমে তারা বাল্য বিবাহের কুফল সম্বন্ধে জানতে পেরেছে এবং বাল্য বিবাহ দিলে যে কি শাস্তি হতে পারে সেই বিষয়েও ওয়াকিবহল হয়েছে। এর জন্য প্রশাসন কে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়। উক্ত দুটি জায়গার মহিলারা আইন সম্বন্ধে আর কিছু জানুক বা না জানুক আঠারো বছরের নিচে মেয়েদের

বিয়ে দেওয়া যে আইনত অপরাধ তা গনমাধ্যমের সাহায্যে ভালভাবেই জেনে গেছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বাল্য বিবাহ ঠেকানোর জন্য যে দল গঠন করা হয়েছে তার প্রভাবে তারা এখন আরও অনেক বেশি সচেতন।

শিক্ষার হার :

উপরিউক্ত সমস্ত ক্ষমতায়নের মূল চাবিকাঠি হল শিক্ষা।শিক্ষা হল একটি জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা না থাকলে কোনো জাতিরই অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই শিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশে নারী শিক্ষার হার আশাব্যাঞ্জক নয়।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতে মুসলিম নারীদের সাক্ষরতার খুবই কম (৫১.৮৯%)। যা সার্বিক সাক্ষরতার হারের(৬৫.৪৬%)থেকে অনেক নিম্নে অবস্থান করছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকেও অনেক নিম্নে। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মুসলিম নারীরা শিক্ষাগত ভাবে পিছিয়ে পড়া একটা শ্রেণী। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম মেয়েদের সাক্ষরতার হার ৬৪.৪ শতাংশ। যা পশ্চিমবঙ্গে নারীর সার্বিক সাক্ষরতা(৭৭.৮%)এর থেকে ১৩.৪ শতাংশ কম[৬]।

আমাদের দেশে একটা সাধারণ ধারনা আছে যে মুসলিম অবিভাবকরা মনে করে মেয়েদের শিক্ষার দরকার নেই, যা একটা ভুল মূল্যবোধ তৈরি করে। যদি মেয়েদের ভরতিও করা হয় তাহলেও একটা সময় পরে গিয়ে তাদের বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্য। এটার ফলেই স্কুলছুটের সংখ্যা মুসলিমদের মধ্যে অনেক বেশি। এটার জন্য অনেকগুলি নির্দেশক আছে যেমন-কাছাকাছি বিদ্যালয় না থাকা, মহিলা ছাত্রাবাস না থাকা,মহিলা শিক্ষিকা না থাকা, অনুদান ও জলপানির ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহী হয়। যদিও অতীতের থেকে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা গ্রহনের হার বেড়েছে তাও এটা খুব একটা দাগ কাটার মতো বিষয় হয়ে ওঠেনি এখনও। ধর্মীয় বিধি নিষেধের কারণে বেশিরভাগ অবিভাবকরা এখনও মেয়েদের সহ-শিক্ষা (co-ed) বিদ্যালয়ে

পাঠানো পছন্দ করে না। বিশেষত যদি বিদ্যালয়টি বাড়ি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হয়। তবে বর্তমানে এই পরিস্থিতির কিছুটা হলেও পরিবর্তন হয়েছে। এ বিষয়ে দুটি এলাকার শিক্ষার বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরার প্রয়াস করব-

শহর পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে নিরক্ষর ৩৪ শতাংশ, প্রাথমিক ৩৪ শতাংশ, মাধ্যমিক ২২ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক ২ শতাংশ এবং স্নাতক ৮ শতাংশ বিবাহিত মহিলাকে পেয়েছিলাম। অন্যদিকে গ্রাম্য এলাকাতেও মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে নিরক্ষর ৪৬ শতাংশ, প্রাথমিক ২২ শতাংশ, মাধ্যমিক ৮ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক ২ শতাংশ এবং স্নাতক স্তরের কোনো মহিলা উত্তরদাতা ছিলেন না। এদের মধ্যেও আবার নিরক্ষর অথচ সই করতে পারেন এমন নারীর সংখ্যা গ্রামটিতে ১৮ শতাংশ। আবার শহর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটিতে নিরক্ষর অথচ সই করতে পারেন, এমন নারীর সংখ্যা গ্রামটিতে ১০ শতাংশ। সুতরাং তুলনামূলক বিচারে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি জায়গার মধ্যেও শহর লাগোয়া এলাকায় নারীরা শিক্ষার দিক থেকে এগিয়ে আছে গ্রাম্য এলাকার নারীরা। বিশেষত কন্যাদের শিক্ষার বিষয়ে গ্রাম ও শহর উভয় এলাকার উত্তরদাতারা সবাই একমত যে, কন্যাদের শিক্ষার প্রয়োজন পুত্রের থেকেও অনেক বেশি। যদিও এর কারণ হিসেবে তারা নারীর স্বনির্ভরতার দিকটিকে এড়িয়ে যাচ্ছে, স্বনির্ভরতার বিষয়টি তাদের কাছে অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল ভাল বাড়িতে বিয়ে দেওয়া ও কন্যা শিক্ষিত হলে ভাল করে সংসার সামলাতে পারবে। বিয়ের পরে যদি উপার্জন করতে চাই তাহলে শ্বশুর বাড়ি থেকে যদি অনুমতি দেয় তাহলে করবে। অন্যথায় বিয়ের আগে পড়ানোর পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ভাল পাত্রে পাত্রস্থ করা।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মুসলিম মহিলারা (৩৬.৩ শতাংশ) হল সমাজের সবথেকে বেশি অশিক্ষিত শ্রেণী। তাদের সাথে একমাত্র তুলনা করা যায় S.C/S.T নারীদের(৩৮.২শতাংশ)। শিক্ষা অর্জনের মাত্রার নিরিখে এক চতুর্থাংশ (২৩. ১শতাংশ) পুরুষ এবং এক পঞ্চমাংশ (২০.১শতাংশ) নারী। শিক্ষা বঞ্চিত মুসলিমদের ক্ষেত্রে এটা একটা সত্য যে, চলতি সময়েও বিদ্যালয়ে যাবার বয়সে (৬-১৪) ভর্তির পরিমাণ খুব কম,

আনুমানিক এক পঞ্চমাংশের ও বেশি বিদ্যালয়ের বাইরে আছে (২০.৭ শতাংশ)[৭]। সর্ব ভারতীয় সমীক্ষা প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিদ্যালয়ছুট বাচ্চাদের মধ্যে মুসলিমরা বেশি সংখ্যায় আছে। পশ্চিমবঙ্গে ৭.৬৭ শতাংশ ৬ থেকে ১৩ বছরের বাচ্চারা বিদ্যালয়ছুট[৮]।

ধর্মীয় অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান : গবেষণা কৃত দুটি জায়গায়ই উত্তর দাতাদের কেউই নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহল নয়। তারা যে একটা দেশের নাগরিক সেই হিসেবে তাদের যে কিছু সাংবিধানিক অধিকার আছে সে বিষয়ে তারা অজ্ঞ। অপরদিকে যে ধর্ম বিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী সেই ধর্ম তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত করার জন্য যে কিছু অধিকার দিয়েছে সে বিষয়েও তারা অবহিত নয়। আইন সম্বন্ধেও তারা সচেতন নয়। আইন সম্বন্ধে তাদের একটাই বক্তব্য তা হল এখন মেয়েদের পক্ষে আইন খুব কড়া। একটাই মাত্র আইন সম্বন্ধে তারা একটু সচেতন আর তা হল নারী নির্যাতন সম্বন্ধিত আইন। আর নারী নির্যাতন বলতে তারা শুধু দৈহিক নির্যাতন কেই বোঝে। মৌখিক নির্যাতন সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারনাই নেই। নির্যাতনের সংজ্ঞা যে বিভিন্ন রকম হতে পারে সে বিষয়ে তারা অবহিত নয়। ধার্মিক অধিকারের দিক থেকেও তারা বঞ্চিত। গবেষণাকৃত গ্রামটিতে কোরান পড়তে পারে সর্বমোট ৫৪ শতাংশ নারী। বাকি ৪৬ শতাংশ মহিলারা কোরান পড়তে পারে না। অপরদিকে গবেষণাকৃত শহর লাগোয়া অঞ্চলটিতে সর্বমোট ৫২ শতাংশ নারী কোরান পড়তে পারে এবং ৪৮ শতাংশ মহিলারা কোরান পড়তে পারে না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, যে উক্ত দুটি জায়গাতেই কোরান পড়া মহিলার সংখ্যাতে খুব একটা তফাৎ নজরে পড়ে না। গবেষণাকৃত গ্রাম্য অঞ্চলটিতে ২০ শতাংশ নিরক্ষর নারী কোরান পড়তে পারে এবং ২৪ শতাংশ পড়তে পারে না। অন্যদিকে গবেষণাকৃত শহর লাগোয়া অঞ্চলটিতে ২৮ শতাংশ নিরক্ষর মহিলা কোরান পড়তে পারে যেখানে ৬ শতাংশ মহিলা পড়তে পারে না। নিরক্ষর মহিলার নিরিখে কিংবা সর্বমোট দুভাবেই বিচার করলে দেখা যাচ্ছে যে, শহর লাগোয়া অঞ্চলের নিরক্ষর নারীরা কোরান পড়ায় এগিয়ে আছে। কিন্তু সমস্যা হল গ্রাম হোক বা শহর উভয় জায়গাতেই মহিলারা কোরান পড়লেও তাঁর অর্থ বোঝে না তারা শুধুমাত্র উচ্চারণ করে পড়ে। প্রকৃত পক্ষে

কোরানে যে মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া আছে সে সম্বন্ধে তাদের সম্যক ধারনাই নেই।

এ বিষয়ে গবেষণা লব্ধ তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলিম মহিলাদের যে মূল ছয়টি ব্যক্তিগত অধিকার কোরান তাদের প্রদান করেছে। সেগুলো সম্পর্কে তারা একেবারেই অবহিত নয়। ফলত অধিকার গুলিকে হাতিয়ার করে তারা তাদের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা অন্যায় অবিচার গুলোকে কোনো ভাবেই প্রতিহত করতে পারছে না। যেমন –

মুসলিম নারীদের প্রথম ব্যাক্তিগত অধিকারটি হল বৈধ উপায়ে উপার্জন ও তা খরচ করার অধিকার। কিন্তু উক্ত দুটি জায়গার নারীরাই তা জানে না, যদিও তারা কিন্তু কোরান পাঠ করে। ফলত যে সব নারীরা উপার্জন করছে তাদের উপার্জিত অর্থে যদি স্বামীরা কখনও ভাগ বাসায় তাহলে তারা প্রতিবাদ করতে পারে না।

ইসলাম অনুযায়ী বিবাহ যোগ্য নারীরা জীবন সাথী পচ্ছন্দ করতে পারে নিজের ইচ্ছায় এবং তাদের বিবাহ দিতে হয় মেয়েটির অনুমতি নিয়ে। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে যে উক্ত গ্রামটিতে একটি মাত্র প্রেম ঘটিত বিবাহ হয়েছে অর্থাৎ মেয়েটির অনুমতি সাপেক্ষে তার পচ্ছন্দসই পাত্রের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাকি সবাই বাবা মার পচ্ছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করেছে। এক্ষেত্রে তাদের মতামত নেওয়া হয়নি যে সেই মেয়েটি এখন বিয়ে করতে চায় কিনা, কিংবা পাত্রটিকে তার পছন্দ কিনা ইত্যাদি। শুধু মাত্র বিয়ের দিন মৌখিক সম্মতি আদায় করা হয়ে থাকে ধর্মীয় রীতি অনুসারে বলাই বাহুল্য যে, তখন সম্মতির কোনো মানেই হয় না। এই পর্যায়টি উক্ত শহুরে নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না হওয়ার জন্য তারা হয়ে রয়েছে অধিকার বঞ্চিত। বিবাহের সময় দেনমোহর পাওয়া মুসলিম নারীদের ধার্মিকভাবে ব্যক্তিগত অধিকার। কিন্তু গবেষণাকৃত দুটি জায়গাতেই কোনো নারীরা মেহের নির্ধারণ করার সুযোগ পায়নি। সব ক্ষেত্রেই তাদের হয়ে নিজের বাবা কিংবা শ্বশুর নির্ধারণ করেছে। যেহেতু নিম্ন মধ্যবিত্ত পারিবারে তাদের অবস্থান তাই দেনমোহরের পরিমান ও খুবই কম। বেশিরভাগ পুরুষই

বিবাহিত জীবন শুরু করার পরেও দেনমোহর পরিশোধ করে না। অর্থাৎ এখানেও নারীরা বঞ্চিত।

বৈধ কারণ দেখিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ও চাইতে পারে মুসলিম নারীরা। কাবিননামার ১৮ নং ঘরে স্বামীর থেকে হ্যাঁ লিখিয়ে নারী এই অধিকার পেতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজের মহিলাদের কাবিননামা সম্পর্কে কোনো ধারনা না থাকায় তারা বিষয়ে অজ্ঞ। তাছাড়া শুধুমাত্র বিয়ে নিবন্ধিকরনের সময় কাবিননামা তাঁর সম্মুখে আনা হয় ফলে ওতে কি লেখা আছে তা পড়ার সুযোগই পায়না মহিলারা। ফলত অশান্তিময় জীবনে ধর্মীয়ভাবে তালাক দেওয়ার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত।

ইসলামিক বিধান অনুযায়ী নারীরা বিয়ের পরেও নিজের Maiden Name অর্থাৎ কুমারী পরিচয় বজায় রাখতে পারবে। কিন্তু গবেষণা কৃত গ্রামটিতে ৯৪ শতাংশ নারী তাঁর স্বামীর পদবি ব্যবহার করছে, এবং এর পিছনে তাদের স্বামীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইচ্ছা রয়েছে। এখানে সর্ব মোট উত্তরদাতা মহিলার ৯৭ শতাংশ স্বামীর পদবি ব্যবহার করছে, মহিলাটির ইচ্ছা ও অনিচ্ছার কোনো দাম নেই। মাত্র ৩ শতাংশ নারী বিবি পদবি ব্যবহার করেন। অন্যদিকে উক্ত শহুরে এলাকায় ৩২ শতাংশ নারী স্বামীর পদবি ব্যবহার করছে বাকি ৭২ শতাংশ নারী গতানুগতিক বিবি পদবি ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে যারা স্বামীর পদবি ব্যবহার করছে তারা নিজ ইচ্ছায় অন্য সম্প্রদায়ের অনুকরনে করছে।

বিবাহের পর যদি একটা মেয়ে একক ভাবে থাকতে চাই তাহলে স্বামীর কর্তব্য তা প্রদান করা। কিন্তু আমাদের সমাজে গ্রাম হোক বা শহর নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে পুরুষের উপার্জন কম হওয়ায় আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। ফলে বিবাহিত নারীকে তাঁর ইচ্ছা হোক বা না হোক স্বামী যে পরিবারে থাকে সেখানেই থাকতে বাধ্য হয়। তবে বর্তমানে পরিস্থিতির একটু হলেও বদল ঘটছে। উত্তরদাতারা শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বহীন থাকলেও তাদের সন্তানরা যারা আধুনিক সময়ে বাস করে তারা কিন্তু শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহল। তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানছে একটু করে। তারা

বাল্যবিবাহ, পণপ্রথার কুফল সম্পর্কে সচেতন। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে গেলে কয়েকটি নীতির উপর জোর দিতে হবে।

১। আরও অনেক বেশি স্কুল স্থাপন করতে হবে যাতে স্কুল দূরবর্তী হওয়ার কারণে কাউকে স্কুল ছুট না হতে নয়। কারণ বাড়ি থেকে স্কুল বেশি দূরে থাকলে অনেকেই তাদের কন্যা সন্তানকে সুরক্ষার জন্য পাঠাতে চান না।

২। তাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে হবে। তাদের হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। শিক্ষার সঙ্গেই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে। কারণ ক্ষমতায়নের মূল চাবিকাঠিই হল অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা।

৪। বেশি করে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। যাতে তারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহল হতে পারে। তারা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে খোজখবর রাখতে পারে ও সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন করতে পারে।

এছাড়াও তাদের জন্য হোস্টেল, অনুদান, সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা উচ্চ শিক্ষার জগতে পৌছতে পারে। কারণ সাচার কমিটির মতে, প্রায় প্রত্যেক তিনটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের একটিতে স্কুল নেই। পশ্চিমবঙ্গে ২৫ জন স্নাতকের মধ্যে মাত্র ১ জন এবং ৫০ জন স্নাতকোত্তরের মধ্যে ১ জন মুসলিম স্টুডেন্ট কলেজ যায়। সমস্ত কোর্সে তাদের অবস্থান নিম্ন, বিশেষত স্নাতকোত্তরে ও বিজ্ঞান কোর্সে প্রান্তিক তাদের সংখ্যা।

তথ্যসূত্র :

১। https://www.en.m.wikipedia.org>wiki>wom...,retrived on 4 May, 2019

২। https://dictionary.cembrige.org>.... retrieved on 4may, 2019

৩। Cornwall, Andrea(2016), 'Womens empowerment: what work?' *Journal of International Development*, 28,p-342-359, published online 28 march 2016

৪। https://www.census2011.co.in retrived on 4may, 2019

৫। Reports of Sachar Committee, 2006

৬। https://www.census2011.co.in retrieved on 1 May, 2019

৭। Reports of Sachar Committee, 2006

৮। Siddiqui, Shamsul Haque and Rahaman, Hasibur, 'Spatial pattern of Muslim women empowerment in West Bengal', *International Journal of Applied Research*, 2016; 2(10), p-257

উপসংহার

সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা হলেও সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। যদিও তা খুবই মন্থর। এই বদলকে আরও তরান্বিত করতে দরকার শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিৎ যাতে বিবাহিত মহিলারা পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সিদ্ধান্তে নিয়ে আসতে পারে। আমার এই গবেষণার কাজের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আসতে পারছেনা,হ্যাঁ অবশ্যই শিক্ষা ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাও শিক্ষার সঙ্গেই একইরকম সমান গুরুত্বপূর্ণ হল কর্মনিযুক্তি। যা সমাজে তাদের অবস্থানকে আরও উন্নত করে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন তাদের আর্থিক স্বাধীনতা দেয়। কারণ এই গবেষণামূলক কাজের মাধ্যমে বলা যায় যে, কর্ম নিযুক্তি উক্ত দুটি জায়গার মহিলাদের ক্ষমতায়নে ধণাত্মক (positive) প্রভাব ফেলেছে। কারণ শুধু শিক্ষা হলেই হয় না, তার সাথে যদি নারী উপার্জনশীল হয় তাহলে পরিবারে তার অবস্থান একটু হলেও বেশি উন্নত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে উক্ত দুটি জায়গার অনেক উপার্জনশীল মহিলাই শিক্ষিত মহিলাদের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতায়িত। সিদ্ধান্ত গ্রহনে অনেক বেশি সক্রিয় তারা।

তাই শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের উপর ও ফোকাস করতে হবে। যাতে তারা একজন নাগরিক, গৃহিণী, মা এবং পরিবারে অর্থ প্রদানকারী, নতুন সমাজ ও জাতি গঠনকারি ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকাতে নিজের অবস্থান পোক্ত করতে পারে। একটি বহুল প্রচারিত কথা এক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি, যে তুমি যদি একটা পুরুষকে শিক্ষা দান কর তাহুলে একটি পুরুষই শিক্ষিত হবে কিন্তু যদি একজন নারীকে শিক্ষিত কর তাহলে পুরো জেনারেশন শিক্ষিত হবে।

তবে সাধারণ ভাবে নারীর ক্ষমতায়ন হলেও নারীরা কিন্তু তাদের ধার্মিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নয়। তা সে শিক্ষিত হোক বা নিরক্ষর। এখনও তারা নিজেদের ধার্মিক

অধিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এক্ষেত্রে তারা এখনও ক্ষমতায়িত হয়নি। এর একটা কারণ হল সচেতনতার অভাব কারণ তারা কোরান পড়লেও তার অর্থ বোঝে না। তাই তাদের উচিৎ নিজের ধর্মীয় ব্যক্তিগত অধিকারগুলি জানা ও সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল- শিক্ষা থাকলেই কিন্তু ক্ষমতায়ন হয় না। শিক্ষা হল ক্ষমতায়নের একটি উপাদান মাত্র। কিংবা শুধু আইন করে নারীদের ক্ষমতায়িত করা যায়না। তার জন্য পুরুষদের পিতৃতান্ত্রিক মূল্য- বোধের ফাঁপা মতাদর্শ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ গবেষণা তথ্য দেখাচ্ছে যে, যে বাড়ির পুরুষরা যত বেশি উদার মনোভাবাপন্ন সেই বাড়ির মহিলারা তত বেশি ক্ষমতায়িত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আসতে পেরেছে। তার সঙ্গে যদি নারীর শিক্ষা যুক্ত হয়ে যায় তাহলে ক্ষমতায়ন নিশ্চিত।

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থ :

১। আলম, গউছুল, *মুসলিম আইন,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৯

২। *আইনে নারীর অধিকার, নারীদের সহায়ক অন্যান্য আইন,* উন্নয়ন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩

৩। *কোরআন শরীফ,* মহঃ শরীক এন্ড সন্স, দিল্লী, ১৯৭৬, পারা নং- ১-১৭

৪। *আইনে নারীর অধিকার, পারিবারিক নির্যাতন ও আপনি,* উন্নয়ন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৩

৫। ওয়াহাব,আব্দুল, *বাংলার বাউল সুফিসাধনা ও সঙ্গীত,* রত্নাবলী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৯

৬। বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী, (সম্পাদিকা)*প্রসঙ্গ মানবী বিদ্যা,* উর্বী প্রকাশন,২০০৮

৭। বাগচি, যশোধরা, ভাদুড়ী, অনিন্দিতা, (সম্পাদিকা), *মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০১

৮। ভট্টাচার্য, মালিনী, (সম্পাদিকা), *আইনি অধিকার জানুন-ছেলে কি মেয়ে ভ্রূনের লিঙ্গ নির্ণয় বিরোধী আইন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস

৯। ব্যানার্জি, গার্গী(সম্পাদিকা), *মেয়েদের অধিকারঃ একটি আইন সহায়িকা,* যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মানবীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্র ও রোসা লুক্সেমবুর্গ স্টিফটুং, কলকাতা, ২০১১

১০। ইবন, আবেদিন, রাদ-আল-মুখতার আলাদার-অল-মুখতার, বেটাস্ক্রিপ্ট প্রকাশনা, ২০১০, খণ্ড-৩

১১। রহীম, মাউলানা মুহাম্মাদ আবদুর, *নারী*, খাইরুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০

১২। সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৪০৭২, খণ্ড-৪, ইসলামিক বুক সার্ভিস, ২০০৫

১৩। Agnes, Flavia, Chandra, Sudhir, Basu, Monmayee, *Women And Law In India*, Oxford University Press, New delhi, 2016

১৪। Fayzee, A.A.A, *Out Lines Of Muhammedan Law*, Editor-Tahir Mahmood, Oxford University Press, 2018

১৫। Thaper Romila, *A History Of India*, Volume-1, Penguin Books, 1990

সহায়ক ইন্টারনেট সুত্র :

১. https://www.barghouti.com>islam>meaning, retrieved on 9 april, 2019

২. https://www.2nau.edu>bio301>context> iscrst ., retrieved on18 april, 2019

৩. https://www.explorethemed.com>riseislam, retrieved on 11april, 2019

৪. https://en.m.wikipedia.org.wiki.islam, retrieved on 18 april, 2019

৫. https://www.feministezine.com/feminist/modern/India-Gender-Community.html, retrieved on 11 april 2019

৬. https://Scroll.in>article>a-short...., retrieved on 18 April 2019

৭. https://www.Slideshare.net>rkubby>talaq, retrieved on 12 april, 2019

৮. https://www.mapsofIndia.com, retrieved on 4 May, 2019

৯. https://evaw-global-database.unwomen.org>asia, retrieved on 4 May, 2019

১০.https://www.ncbi.nlm.nin.gov>pubmet, retrieved on 25 April, 2019

১১. https://www.en.m.wikipedia.org, retrieved on 9 May, 2019

১২.https://www.en.m.wikipedia.org>wiki>wom...,retrieved on 4 May, 2019

১৩.https://dictionary.cembrige.org> .... retrieved on 4 May, 2019

১৪.https://www.sensus2011.co.in retrieved on 4 May, 2019

সহায়ক প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন :

১. Cornwall, Andrea(2016), Womens empowerment: what work? *Journal of International Development*,28,published online 28 March 2016

২. Report of Sachar Committee, 2006

৩. Siddiqui, Shamsul Haque and Rahaman, Hasibur, 'Spatial pattern of Muslim women empowerment in West Bengal', *International Journal of Applied Research*, 2016; 2(10)

সাক্ষাৎকার :

১। বসিরন বিবি,মন্দির বাজার,২৩ জানুয়ারি,২০১৮

২। নুরজাহান হালদার,মন্দির বাজার,২৩ জানুয়ারি,২০১৮

৩। রহিতন মিস্ত্রি,মন্দির বাজার,২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪। সাতবানু গায়েন, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৫। মুসলিমা গায়েন, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৬। নছিমুন হালদার, মন্দির বাজার,২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৭। তহেরন সেখ, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৮। নজুমন বিবি, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৯। রুকসানা মিদ্দে, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

১০। জইগুন হালদার, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

১১। তমিনা মিদ্দে, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

১২। রেহানা সেখ, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

১৩। ছমিওন জমাদার, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

১৪। নবিওন জমাদার, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

১৫। রেহানা জমাদার,মন্দির বাজার,২৩ জানুয়ারি,২০১৮

১৬। মাসুদা সেখ, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

১৭। রেজিনা সেখ, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

১৮। মজিদন মিদ্দে, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

১৯। নুরানা মিদ্দে, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

২০। রেহানা মিদ্দে, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

২১। জানাহা বিবি, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

২২। মাসুদা বৈদ্য, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

২৩। আসমিরা হালদার, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

২৪। আজিজা মিস্ত্রি, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

২৫। কারিমা জমাদার, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

২৬। সানজিদা হালদার, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

২৭। সামিওন মল্লিক, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

২৮। এসমতারা গাজী, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

২৯। মাবিয়া মিস্ত্রি, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৩০। সাবিনা সেখ, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৩১। আনোহারা জমাদার, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৩২। রোজিনা গায়েন, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৩৩। নাজমা মিদ্দে, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৩৪। হাবিবা জমাদার, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৩৫। সামনুর সেখ, মন্দির বাজার, ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮

৩৬। রেজিনা গায়েন, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৩৭। তসলিমা মিস্ত্রি, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৩৮। রেশমা মোল্লা, মন্দির বাজার, ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮

৩৯। নুরনেদা মিস্ত্রি, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪০। সেরিনা জমাদার, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪১। নাসিরা সেখ, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪২। সুফিয়া মিদ্দে, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪৩। মুর্শিদা হালদার, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪৪। রহিনা মিদ্দে, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪৫। তুহিনা মিদ্দে, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪৬। মঞ্জুরা পিয়াদা, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪৭। মমতাজ মিদ্দে, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪৮। রুনা লায়লা মিস্ত্রি, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৪৯। রহিমা সেখ, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৫০। নাফিসা মোল্লা, মন্দির বাজার, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৮

৫১। ফতেমা বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৫২। সূর্য বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৫৩। রুকিয়া বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৫৪। ছায়াতন বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৫৫। সাহিদা লস্কর, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৫৬। সরবানু বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৫৭। সুফিয়া বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৫৮। খুকুমনি বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৫৯। রেজিনা বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৬০। ছানিয়া মণ্ডল, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৬১। সাবিনা বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৬২। নন্দা বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৬৩। বেবি বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৬৪। সাবিনা বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৬৫। খুকু বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৬৬। মমতাজ বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৬৭। ফতেজা বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৬৮। পাখি বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৬৯। লালি বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৭০। রেশমা বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৭১। ফরিদা বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৭২। রাবিনা মাল, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৭৩। ফরিদা নস্কর, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৭৪। রসিদা বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৭৫। ভাদুরি বিবি, বারুইপুর, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৮

৭৬। ইসামিন বিবি, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৭৭। রবিনা বিবি, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৭৮। সিস্মিয়ারা বিবি, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৭৯। তাহেরা বিবি, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৮০। রাকিবা বিবি, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৮১। সালেহা বিবি, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৮২। ফতেমা বিবি, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৮৩। সাহানারা মণ্ডল, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৮৪। রাবেয়া লস্কর, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৮৫। মায়বানু সরদার, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৮৬। রাবেয়া সরদার, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৮৭। আলিমা সরদার, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৮৮। আমিনা হালদার, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৮৯। সায়েরা বিবি, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি,২০১৮

৯০। মুসলিমা বিবি, বারুইপুর,১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৯১। বেবি মণ্ডল, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৯২। তনুজা বিবি,বারুইপুর,১৭ জানুয়ারি,২০১৮

৯৩। জারফিন লস্কর, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৯৪। ফিরোজা বিবি, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৯৫। রুম্পা বিবি, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি,২০১৮

৯৬। মারুফা লস্কর, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৯৭। ফিরোজা বেগম, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৯৮। জেনিফা পারভিন, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

৯৯। সাহানা মণ্ডল, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮

১০০। ইসমাতারা সরদার, বারুইপুর, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮